হযরত মাওলানা উমর পালনপূরী (রহ.)

বিশ্বব্যাপি

তাবলীগ আমার কাজ

মাওলানা যাইনুল আবিদীন

অনূদিত

এদারায়ে কুরআন

৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আমার কথা

ইংরেজী '৮৪ কি '৮৫ সালের কথা!

তখন ঢাকার ফরিদাবাদ মাদরাসায় পড়ি। হযরাতুল উস্‌তায মাওলানা বশীর উদ্দীন সাহেব (ঢাকার হুযুর) নিয়ে গেলেন বিশ্ব ইজতিমায়। বা'দ মাগরিব হযরাতুল উস্তায বললেন ঃ যাইনুল আবিদীন! এখন আলোচনা করবেন মাওলানা উমর পালনপূরী! মন দিয়ে শুনুন! অসম্ভব ভাল লাগবে।

কিন্তু সেই ভাললাগা যে এত গভীর ভাললাগা তা কিন্তু ভাবতে পারিনি। এক দিনের আলোচনা শোনেই আমি তাঁর ভক্ত হয়ে গেলাম। সত্যি বলতে কি, তারপর থেকে প্রতি বছর বিশ্ব ইজতিমায় শরীক হতাম সবিশেষ মাওলানার আলোচনা শোনার জন্যে। মাওলানার মত এতটা প্রমানসিদ্ধ, হৃদয় নিংড়ানো আবেগভেজা বয়ান আমার ক্ষুদ্র জীবনে আমি আর শুনিনি – আক্ষরিক অর্থেই। মূলতঃ তাঁর প্রতি অধমের গভীর শ্রদ্ধা, বিশ্বাস আর অনুরাগের ফসলই এই অনুবাদ গ্রন্থ – যা কি-না আমার দীর্ঘ দিনের স্বপ্নের রূপায়ন।

আমার বিশ্বাস, তাবলীগ জামাতের সাথে যা'রা সম্পৃক্ত নন তাঁরাও এই আলোচনাগুলো পড়ে প্রানিত হবেন। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য-অতঃপর একটি শান্তিময়; নিরাপদ, ইলাহী প্রেমে মাতোয়ারা পৃথিবী রচনার যে স্বপ্নের কথা মাওলানা'র বক্তৃতামালায় বাঙময় হয়ে উঠেছে তা যে কোন ইসলাম প্রিয় মানুষের হৃদয়ে নব আন্দোলনের সৃষ্টি করবে; সৃষ্টি করবে আমাদের চেতনার মৃতসাগরে ভাবের-আবেগের উচ্ছসিত উর্মি-তরঙ্গ।

প্রকাশক বন্ধুবর মাওলানা আরিফ বিল্লাহ'র তাড়া না পেলে অবশ্য এত তাড়াতাড়ি অনুবাদ সম্পন্ন করতে পারতাম না। আমি তার কাছে ঋনী। অনুবাদ মূলানুগ ও সাবলীল করতে চেষ্টা করেছি। কতটা সফল হয়েছি সে বিচার পাঠকের হাতে। তারপরও কোনরূপ ভুল-ত্রুটি কিংবা অসঙ্গতি নজরে পড়লে আমাদেরকে জানালে শুকরিয়ার সাথে বিবেচনার অঙ্গীকার রইল।

বইটির প্রুফ সংশোধন করে দিয়েছেন একজন দরাজদিল মানুষ, প্রবীন সাংবাদিক, দৈনিক বাংলা বাজার পত্রিকার বিভাগীয় সম্পাদক, অগ্রজপ্রতীম সহযাত্রী ডাঃ সিদ্দীকুর রহমান সাহেব। তাঁকে কাগুজে শুকরিয়া জানাবার মত লৌকিকতা কিভাবে দেখাই?

হে আল্লাহ! আমাদের এই ক্ষুদ্র মেহনতকে পরকালে নাজাতের উসীলা হিসাবে কবুল করুন। আমীন!!

যাইনুল আবিদীন
২৮.০১.২০০০ইং

প্রকাশকের আরয

মাওলানা উমর পালনপূরী (রহ.)!

তাবলীগ জামাতের ইতিহাসে এক জীবন্ত কিংবদন্তী! সবিশেষ তুরাগ নদীর তীরে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ইজতিমার এই প্রানপুরুষ এদেশের সকল শ্রেণীর দীনদার মুসলমানদের এক ঘনিষ্ঠ রাহ্‌নুমা - হৃদয়ের আত্মীয়! সে সুবাদেই তাঁকে ভালবাসি আমি, ভালবাসি তাঁর প্রতিটি উচ্চারণকে।

আজ তিনি নেই। আছে তাঁর অমর বক্তৃতাগুলো। আছে তাঁর শাশ্বত কথামালা; উম্মতের প্রতিটি সদস্যের প্রতি দরদ স্নাত পরামর্শ। তাঁর সেই পথনির্দেশ, হিদায়াত ও বক্তৃতামালা থেকে চারটি বক্তৃতার অনুবাদ 'বিশ্বব্যাপী তাবলীগ আমার কাজ' নামে পাঠকের হাতে তুলে দিচ্ছি – হযরত (রহ.) এর প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার স্মারক হিসাবে। সন্দেহ নেই, বক্তৃতাগুলো মাওলানার বিশ্বাস, চেতনা ও আন্তরিক আহ্বানের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি তুলে ধরবে আমাদের সামনে। যা এই মুহূর্তে আমাদের জন্যে খুবই প্রয়োজন।

বক্তৃতাগুলোর অনুবাদ করেছেন বিদগ্ধ অনুবাদক, সাংবাদিক ও মুহাদ্দিস মাওলানা যাইনুল আবিদীন। তিনি শুধু মাওলানার প্রতি-ই নন–মাওলানার মিশনের প্রতিও আন্তরিক এবং বিশ্বাসী। যে কারণেই আমাদের বিশ্বাস, মূল উর্দু ভাষায় নিবেদিত মাওলানা'র আবেদন স্বমহিমায় অক্ষুন্ন রয়েছে বাংলা ভাষাতেও। অবশ্য প্রথম সংস্করণ হিসাবে ভুল ত্রুটি থেকে যাওয়াও বিচিত্র কিছু নয়। এক্ষেত্রে আমরা হৃদয়বান পাঠকদের সুদৃষ্টি কামনা করছি।

বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে যাঁরা আমাকে উৎসাহিত করেছেন, বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন আমি তাঁদের সকলের প্রতিই কৃতজ্ঞ। দু'আ করি, আল্লাহ আমাদের সকলকেই তাঁর দীনের জন্যে কবুল করুন। আমীন!

এদারায়ে কুরআন — আরিফ বিল্লাহ

বাংলাবাজার, ঢাকা — ২৮.০১.২০০০ইং

সূচিপত্র

প্রথম বয়ান

দ্বিতীয় বয়ান

তৃতীয় বয়ান

চতুর্থ বয়ান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا-

اَمَّا بَعْدُ؛ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ؛ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- "اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ - نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِىْ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ- نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ - وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ- وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ - اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ- وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ-

সম্মানিত ভাই ও বন্ধুরা!

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ ফরমান ঃ 'নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ নাও। ইহকাল ও পরকালে আমিই তোমাদের বন্ধু। সেখানে তোমাদের জন্যে আছে যা তোমরা দাবী করবে। এটা ক্ষমাশীল করুণাময়ের পক্ষ থেকে সাদর আপ্যায়ন। যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি একজন আজ্ঞাবহ, তার কথার চাইতে উত্তম কথা আর কার হতে পারে? ভাল ও মন্দ সমান নয়। জবাবে তাই বলুন যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু।' (হা-মীম-সেজদাহ ঃ ৩০-৩৪)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন ঃ 'ফেরেশতা যখন তাদের মুখমন্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে, তখন তাদের অবস্থা কেমন হবে?' (মুহাম্মদ ঃ ২৭)

প্রতিটি মানুষের চারটি মনযিল আছে

সম্মানিত বন্ধুরা! প্রতিটি মানুষের চারটি মন্‌যিল আছে। প্রথম মন্‌যিল মায়ের গর্ভ। দ্বিতীয় মন্‌যিল পৃথিবীর গর্ভ। তৃতীয় মন্‌যিল কবরের গর্ভ। চতুর্থ মন্‌যিল আখেরাত। প্রতিটি মানুষকেই এ চারটি মন্‌যিল অতিক্রম করতে হয়। মায়ের গর্ভে আল্লাহ মানুষের শরীর সৃষ্টি করেন। অতঃপর এক অন্ধকার জগতের সেই সংকীর্ণ স্থানেই 'রূহ' দান করেন।

মানুষকে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে প্রেরণ করেন যেন অসম্মানের পথ বর্জন করে মর্যাদা ও সম্মানের পথ অবলম্বন করে। তার প্রতি কৃত আল্লাহর অনুগ্রহসমূহের যেন সে মূল্যায়ন করে।

إِمَّا شَاكِرًا وَّإِمَّا كَفُورًا ۔

(হয়তো কৃতজ্ঞ হবে নইলে হবে অকৃতজ্ঞ।) কামনা এটাই, যেন সে আল্লাহর কথার অনুসরণ করতে করতেই ইহধাম ত্যাগ করে।

সামান্য সময়ের স্বাধীনতা

এই জগতে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সামান্য একটু স্বাধীনতা দিয়েছেন। তাও খুব সামান্য সময়ের জন্যে। সম্পূর্ণ অধিকার স্বাধীনতা ও এখতিয়ার

মানুষের হাতে ছেড়ে দেননি। পূর্ণ এখতিয়ার পেলেতো মানুষ কখনো অসুস্থ হতো না, বৃদ্ধ হতো না, পরাজিত হতো না। অধিকাংশ মানুষই তো মৃত্যুকে এড়িয়ে চলতে চায়। সুযোগ থাকলে কেউ মৃত্যুর হাতে ধরা দিত না। কিন্তু মানুষকে আল্লাহ তায়ালা পূর্ণ স্বাধীনতা দেননি। বরং ভাল-মন্দের খুব সামান্য এখতিয়ার-স্বাধীনতা প্রদান করেছেন। এই হাত আল্লাহই দিয়েছেন। চাইলে কেউ এই হাতে এতীম-অসহায়দেরকে খাবার বিতরণ করতে পারে, আবার চাইলে এই হাতে অন্যের খাবার ছিনিয়েও আনতে পারে। এ দুটোই আল্লাহর দান।

মায়ের গর্ভে মানুষ অসহায়, একান্ত বাধ্যগত, শুধুই আল্লাহর অধীন। তিনি যেভাবে সৃষ্টি করেছেন সেভাবেই জন্মেছে সে। পুত্র বানিয়েছেন, কন্যা বানিয়েছেন। কালো বানিয়েছেন, সুন্দর বানিয়েছেন। বুদ্ধিমান বানিয়েছেন, বোকা বানিয়েছেন। যেভাবে চেয়েছেন সেভাবেই বানিয়েছেন। সেখানে কারও কোন অধিকার নেই, এখতিয়ার নেই। তিনি যাকে যে বংশে চেয়েছেন তাকে সেই বংশেই সৃষ্টি করেছেন।

এই পার্থিব জগতে আসার পর তাকে কিছু স্বাধীনতা, কিছু এখতিয়ারও অধিকার দান করেছেন। খুব সামান্য সময়ের জন্যে আর তার সীমানা হলো মৃত্যু পর্যন্ত। যদি এই সময়টুকুতে মানুষ তার ইচ্ছা ও স্বাধীনতাকে আল্লাহ'র সন্তুষ্টি মাফিক ব্যবহার করে তাহলেই সে কামিয়াব ও সফলকাম। উভয় জগতে সার্থক। আর যদি মানুষ তার ইচ্ছাকে নিজের সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করে তাহলে সে উভয় জগতেই হবে পেরেশান, অস্থির, ব্যর্থ ও ধ্বংস।

আল্লাহর অসন্তুষ্টিই বিপদের কারণ

এক হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি আরেক হলো নিজের সন্তুষ্টি। আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে চলতে গেলে মুজাহাদা করতে হয়। নিজের সন্তুষ্টিকে বর্জন করতে হয়। অথচ নিজের সন্তুষ্টির পথে চলা খুব সহজ। মন যা চাইল তাই করল। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি বর্জিত হলে আল্লাহ খুব অসন্তুষ্ট হন। আর আল্লাহর অসন্তুষ্টি মানেই মহাবিপদ।

আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। চন্দ্র-সূর্য তাঁরই সৃষ্টি। তিনিই সংকীর্ণ অন্ধকার জগতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তার অসন্তুষ্টিতে মানুষ বিচলিত হয়, পেরেশান হয়।

ধীর পাকড়াও

তবে আল্লাহ এতটুকু অনুগ্রহ অবশ্যই করেন, মানুষ তাঁর অসন্তুষ্টির পথে পা বাড়াতেই থাকে, তবু তাকে পাকড়াও করেন না। বরং তার হেদায়েতের ব্যবস্থা করেন। পরিশুদ্ধির পথ করে দেন। এতেও যদি সে পথ না পায়, পরিশুদ্ধ না হয় – তবুও পাকড়াও করেন না।

হযরত মূসা (আঃ) ও ফেরাউনের তর্ক

ফেরাউন! আপন দৃষ্টিতে খোদা। এ দাবীতে অটল। তাই বলে প্রথমেই তাকে পাকড়াও করেননি আল্লাহ। হযরত মূসা (আঃ)-কে প্রেরণ করেছেন বুঝাবার জন্যে। সে হযরত মূসা (আঃ)-কে উপহাস করেছে। মূসা (আঃ) আবারও বুঝিয়েছেন। সে করেছে ঠাট্টা, করেছে বিদ্রূপ। তৃতীয়বার বুঝাতে চেয়েছেন আর অমনি রাগে-রোষে ফেটে পড়েছে ফেরাউন। বলে ওঠেছে,

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلٰهًا غَيْرِىْ لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ (پاره/١٩)

'আমি ব্যতীত অন্য কাউকে মা'বুদ মানলে আমি তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করব।' তার এ বিষয়ে অভিজ্ঞতাও ছিল। বহু মানুষকে অন্ধ কারাগারে পাঠিয়েছে। হযরত মূসা (আঃ) বললেন ঃ

قَالَ اَوَلَوْجِئْتُكَ بِشَيْئٍ مُبِيْنٍ (پاره/ ١٩

'আমি যদি সুস্পষ্ট কিছু নিয়ে এসে থাকি, তবুও ?' সেতো কল্পনাও করেনি মূসা (আঃ) আবার সুস্পষ্ট কি নিয়ে আসবেন ! তাঁর আনার-ই বা কি আছে? সে বলল ঃ

قَالَ فَاْتِ بِهٖ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ (پاره/ ١٩)

'তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে নিয়ে আস।'

হেদায়াতের পাথেয়

এবার হযরত মূসা (আঃ) তাঁর লাঠিটি মাটিতে ছেড়ে দিলেন। লাঠি এক বিরাট অজগর বনে গেল। স্বীয় হাত বগলের তলে চেপে ধরে বের করতেই উজ্জ্বল আলোকময় হয়ে ওঠল।

এ ছিল ফেরাউনের জন্যে হেদায়াতের পাথেয়, পথপ্রাপ্তির উপায়-উপকরণ।

তার উচিত ছিল, এই মু'জিযা-অলৌকিক কান্ড দর্শনে হযরত মূসার (আঃ) আনুগত্য করা। তাঁর কথা মেনে নেয়া। তাঁকে আল্লাহ প্রেরিত নবী হিসেবে গ্রহণ করা। কিন্তু সে তা করেনি। অতঃপর মূসা (আঃ) অজগর তুলে নিলেন এবং তা লাঠি বনে গেল।

তাৎক্ষণিকভাবে ফেরাউন কিছুটা ঘাবড়ে গিয়েছিল। ভীত-শংকিত হয়েছিল। তারপর সে মিটিং ডাকল। সকল সদস্যদেরকে একত্রিত করল। ফেরাউন ও তার সভাসদরা ভাবল, মূসা (আঃ) তো একজন যাদুকর। তারা ঠিক করল, এর প্রতিরোধে সকল যাদুকরকে একত্রিত করা হোক। আদেশ পেয়ে যাদুকররা এলো। অসংখ্য দর্শনার্থী এলো। যাদুকররা তাদের যাদু প্রদর্শন করল। যাদুকররা কিছু রশি মাটিতে ছেড়ে দিল আর সেগুলো সাপ-বিচ্ছু হয়ে চারদিকে ছুটাছুটি করতে লাগল।

হযরত মূসার (আঃ) লাঠি ও যাদুকরদের ঈমান

এবার হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহর নির্দেশে স্বীয় লাঠিটি ছেড়ে দিলেন। লাঠি অজগর হয়ে যাদুকরদের সকল সাপ গিলে ফেলল। এ দেখে যাদুকরদের বুঝতে অসুবিধা হলো না, হযরত মূসা (আঃ) যাদুকর নন। তিনি আল্লাহ'র নবী। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই সিজদায় পড়ে গেল। সমস্বরে বলতে লাগল,

قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ- (پاره/٩)

'আমরা বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক, মূসা ও হারূনের রবের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম।'

ফেরাউনের রাগ

এই দৃশ্য দর্শনে ফেরাউনের ভীষণ রাগ হল। সে বলল, আমি তোমাদেরকে পুরস্কৃত করব বলেছিলাম। নিজের একান্তজনের মর্যাদা দেব বলেছিলাম। আর তোমরা তার লোক হয়ে গেলে ! রোষের অতিশয্যে সে বলে ওঠল,

لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ (پاره/٩)

'আমি তোমাদের সকলকে শূলীতে চড়াবো।'

দুর্ভেদ্য ঈমান ও পরকাল ভাবনা

কিন্তু যাদুকরদের ঈমান এতটা শক্তিশালী হয়ে ওঠেছিল, পরকাল ভাবনা এতটা বীর্যবান হয়ে ওঠেছিল, তারা বলে ওঠল, শূলীতে চড়তে আপত্তি নেই, তবে পরকাল যেন বরবাদ না হয়। কারণ, পরকাল হলো অবিনশ্বর চিরন্তন।

প্রিয় বন্ধুরা ! আরয করছিলাম, একটি মনযিল হলো মায়ের গর্ভ, আরেকটি হলো পৃথিবীর গর্ভ। এই পৃথিবীতে সে হয়তো নিজের সন্তুষ্টির পথে চলবে অথবা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে। চলার পথ এই দু'টি। মানুষ কখনো এই পথে চলে, কখনো ওই পথে। কিছু লোক সরলপথে পরিচালিত হয়ে কিছু লোক পরিচালিত হয় বক্রপতে।

কবরের মন্‌যিল

তারপর তৃতীয় মন্‌যিল কবর পার্থিব জগতে যে ব্যক্তি সরলপথে চলেছে কবরের মন্‌যিলে সে বেশুমার সুখ ও শান্তির সাক্ষাৎ পাবে। আর বক্রপথের পথিকরা পাবে সীমাহীন কষ্ট।

দৃষ্টির অন্তরালে

তবে কবর জগতের সুখ-শান্তি, দুঃখ-বেদনা পার্থিব জগতের লোকেরা দেখতে পায় না। তারা ও সবের কিছুই জানে না। এমনকি যারা পরকালে বিশ্বাসী, তারাও যদি বারবার এগুলোর আলোচনা না করে, চর্চা না করে তাহলে মন থেকে সরে যায়। ভুলে যায় সেই মন্‌যিলের কথা।

কবর মন্‌যিলের বিস্তৃতি কিয়ামত পর্যন্ত। সত্য সাধু ঈমানও আমলে সমৃদ্ধ ব্যক্তিরা যখন কবরে পদার্পণ করে তখন তাকে সমূহ সুসংবাদ শোনানো শুরু হয়। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا-

'নিশ্চয় যারা বলে, আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক অতঃপর (এর উপর) অবিচল থাকে।' অর্থাৎ আমৃত্যু প্রতিষ্ঠিত থাকে এই মহান বিশ্বাসের উপর পূর্ণ বিশ্বাসও আস্থার সাথে এবং মনে করে আল্লাহর নির্দেশ আমাদের স্বভাববিরোধী হতে পারে কিন্তু তাঁর তারবিয়্যত প্রতিপালন আমাদের বিরুদ্ধে নয় – হতে পারে না।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে।'

অতঃপর তিনি প্রার্থনা করিয়েছেন –

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

'আমাদেরকে সরল সঠিক পথের সন্ধান দিন।'

অর্থাৎ যখন আল্লাহকে প্রতিপালক হিসাবে স্বীকার করবে এবং আমরণ তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে তাহলে তার প্রতিদান হবে

تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ

মৃত্যুর সময় 'তাদের প্রতি ফেরেশতাদল অবতীর্ণ হবে।' তারা কথাবার্তা বলবে। তারা বলবে,

اَلَّا تَخَافُوْا

এসে পড়েছ তো কি হয়েছে! 'ভয় করো না।' তোমাদের ভয় পাবার কারণ নেই। অতঃপর বলবে,

وَلَا تَحْزَنُوْا

'চিন্তিত হয়ো না'। তোমাদের ফেলে আসা সম্পদ নিয়ে ভেবনা। যা হারিয়েছ তারচে' অনেক বেশি পাবে।

وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ

'যে জান্নাতের অঙ্গীকার তোমাদেরকে করা হতো সেই জান্নাতের সুভ সংবাদ গ্রহণ কর।' তারা আরও বলবে,

نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ

'আমরা পৃথিবীতেও তোমাদের বন্ধু ছিলাম, পরকালেও তোমাদের সাথেই আছি।' পার্থক্য শুধু এতটুকু, দুনিয়াতে ফেরেশতা দেখা যায় না। এখন মৃত্যু সমাগত, এখন সবই দেখা যাচ্ছে। আজ যা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, কাল তা প্রচ্ছন্ন হয়ে যাবে। আজ যা অদৃশ্য হয়ে আছে, কাল তা হবে প্রত্যক্ষ বাস্তবতা। মৃত্যুর পূর্বে যা প্রত্যক্ষ হচ্ছে মৃত্যুর সময় তার কিছুই দৃষ্টিগোচর হবে না। পক্ষান্তরে মৃত্যুকালে যা ভাস্বরিত গোচরীভূত হবে, তা এখন কিছুতেই প্রত্যক্ষ হবার নয়।

দুনিয়াতে মানুষ যা দেখতে পায়

মানুষ এই ভূপৃষ্ঠে কি দেখতে পায়? সে দেখতে পায়– রাজত্ব, অর্থ-সম্পদ, সোনা-রূপা, দোকান-পাট, ক্ষেত-খামার। সে মনে করে এসবের যতটুকু আমি অর্জন করতে পারব আমার জীবন ততটুকুই প্রতিষ্ঠিত হবে।

মানুষ যা দেখতে পায় না

মানুষ দেখতে পায় না ঈমান ও আমলের বলে জীবন প্রতিষ্ঠাকে। ঈমান-আমল অর্জন হলে জীবন গড়ে ওঠবে এটা তার ভাবনাতীত। যখন মৃত্যু এসে উপস্থিত হয় তখন টাকা-পয়সা, অর্থ-সম্পদ ও রাজত্বের দাপটে অর্জিত সফলতার সমূহ পথ বন্ধ হয়ে যায়, তখন ঈমান ও নেক আমলের স্পর্শেই যে সফলতা থাকে তা দেখা যেতে শুরু হয়। পক্ষান্তরে যদি ঈমান ও নেক আমলের প্রস্তুতি না থাকে তাহলে নবীগণ যে সব বিচলতা ও পেরেশানীর কথা বলেছেন তার মুখোমুখি হতে হবে। আর তখনই মানুষ অস্থির ও দিশেহারা হয়ে পড়ে; ভাবে, 'একি হলো?'

সুতরাং আজ যা প্রত্যক্ষ হচ্ছে মৃত্যুর সময় তা অদৃশ্য হয়ে যাবে আর আজ যা অদৃশ্য হয়ে আছে তখন তা স্বরূপে দৃশ্যমান হতে থাকবে।

হযরত উমরের (রাঃ) পরকাল ভয়

এ কারণেই হযরত উমর (রাঃ)-কে যখন ছুরিকাঘাত করা হয় তিনি সেখানেই গড়িয়ে পড়েন। রক্তের ফোয়ারা প্রবাহিত হতে থাকে। উমর (রাঃ) বিচলিত হয়ে পড়েন। তাঁকে তুলে আনা হয়। বিছানায় শুইয়ে দেয়া হলে তিনি বলতে থাকেন, একটু পরেই এই পার্থিব জগত অদৃশ্য হয়ে যাবে আর আখেরাত এসে উপস্থিত হবে ! জানি না আমার সাথে কি আচরণ করা হবে !

হে আল্লাহ ! তুমি যদি আমার নেক আমলগুলোর কোন প্রতিদান না দাও তাহলে শুধু আমার পাপগুলোর জন্যে পাকড়াও করোনা ! আমার নেকী-বদী বরাবর করে দাও ! আমি রাজী আছি, আমি প্রস্তুত আছি !

কারণ, আল্লাহ যখন অপরাধের জন্যে পাকড়াও করবেন, তাঁর পাকড়াও খুবই ভয়ানক পাকড়াও হবে !

কে জানে কার সাথে কি আচরণ হয়

মৃত্যুর পর যখন কবরে রাখা হবে, জানা নেই তখন কার সাথে কি আচরণ করা হবে। যদি পৃথিবীতে থাকতেই আমাদের মধ্যে এই চিন্তার সঞ্চার

হয়, প্রতিটি পদক্ষেপেই যদি পরকালীন জীবনের কথা স্মরিত হয়, তাহলে আল্লাহর দরবারে আশা করা যায়, তিনি হয়তো তাঁর বিধানগুলো মানার শক্তি দিবেন – তাওফীক দিবেন।

আল্লাহর হুকুম ও নবীর সুন্নাতের বিনিময়

এটাতো সম্ভব নয় যে, আমরা ঘর-বাড়ি ছেড়ে দেব, ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দেব। যেমন, হযরতজী তাঁর বিবাহ বিষয়ক আলোচনায় যে কথাগুলো বলেছেন আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী স্ত্রীর মুখে লোকমা তুলে দেয়াও পুণ্যময় কাজ, সওয়াবের আমল।

দুনিয়াতে আমরা যেসব কাজ করি সেগুলোই যদি আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা অনুযায়ী করি, তাহলে আল্লাহ তায়ালা আমাদের পার্থিব প্রয়োজনও পূরণ করে দিবেন তৎসঙ্গে পরকালীন প্রতিদানও দিবেন।

হযরত উমরের অস্থিরতা

শাহাদাত প্রান্তে উমর অস্থির বিচলিত ! পরকাল ভাবনায় তিনি কান্নামুখর। তখন ইবন আব্বাস (রাঃ) আরয করলেন ঃ 'আমীরুল মুমিনীন ! আপনি এত চিন্তিত কেন ? রাসূল (সাঃ) আপনার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন ওফাত পর্যন্ত। আবু বকর (রাঃ) বিদায় নিয়েছেন আপনার প্রতি সন্তুষ্ট চিত্তে। পৃথিবীর কত বিস্তৃত অঙ্গনে আপনার উসিলায় ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বিস্তৃত হচ্ছে নিয়মিত। এরপরও আপনি এত চিন্তিত কেন ?' এর জবাবে হযরত উমর (রাঃ) বলেন –

'হে রাসূলের চাচাত ভাই ! এই কথাগুলো কি তুমি কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনেও বলবে? কারণ, কিয়ামতের দিনটি হবে খুবই কঠিন। সকলের কৃতকর্ম সামনে উপস্থিত থাকবে। জানা নেই শেষ ফয়সালা কি হবে ?"

তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ) বললেন ঃ 'কিয়ামতের দিন আমি আল্লাহর সামনে এই কথাগুলো বলব।'

আমার মাথা ধুলোমলিন হ'তে দাও

হযরত উমরের উক্তি ! হযরত উমরের (রাঃ) মাথা তদীয় পুত্রের উরুর উপর। তিনি তাঁর পুত্রকে বলছেন ঃ 'বৎস, আমার মাথাটি মাটিতে ফেলে দাও। ধুলোমলিন হতে দাও। আমার মাথা কারও উরুর উপর থাকার উপযুক্ত নয়।'

তাক্ওয়া যেভাবে সৃষ্টি হয়

একটি কথা মনে রাখতে হবে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক যতটুকু প্রতিষ্ঠিত হবে, আল্লাহর সাথে পরিচয় যতটুকু হবে, আল্লাহ ধ্যান হবে যে পরিমাণ, আল্লাহকে সন্তুষ্ট রাখার চেতনা শক্তিশালী হবে যতটুকু, আল্লাহভীতি সৃষ্টি হবে ততখানিই – ততখানিই তাক্ওয়া সৃষ্টি হবে হৃদয়-মানসে।

পক্ষান্তরে মানুষ আল্লাহ থেকে যত দূরে সরে যাবে, আল্লাহ'র ধ্যান থেকে যতবেশী বিমুখ হবে, অন্যায়-অপরাধে ততবেশী বেপরোয়া হবে, ধাবিত হবে সমূহ অবিচারের প্রতি, পাপ কর্মের প্রতি– ততবেশী আল্লাহর নৈকট্য থেকে দূরে সরে পড়বে।

মূলত তাক্ওয়ার এই মহাগুণ হযরত উমর (রাঃ)-এর মধ্যে ছিল বলেই তিনি আল্লাহকে এভাবে ভয় করেছেন। যে আল্লাহকে যত বেশী ভয় করে আল্লাহ তাকে সেই পরিমাণে তাকওয়া দান করেন এবং মুত্তাকীদের আমল আল্লাহ পছন্দ করেন।

اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ (پاره/٦)

'আল্লাহ মুত্তাকীদের আমল কবুল করেন।' আমি আরয করছিলাম, আজ আমরা যা দেখতে পাচ্ছিনা তা মৃত্যুর সময় দেখতে পাব আর আজ যা দেখতে পাচ্ছি মৃত্যুর সময় তা অদৃশ্য হয়ে যাবে। আর তখন কারোরই কিছু করার থাকবে না। ঠিক সেই সময় ফেরেশতাগণ বলবে,

نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ

'আমরা পার্থিব জগতেও তোমাদের সঙ্গী ছিলাম পরকালেও সঙ্গী থাকব।' ব্যবধান শুধু এতটুকু পৃথিবীতে আমরা ছিলাম অদৃশ্য আর এখন থেকে থাকব দৃশ্যমান।

ফেরেশতা-ই-ফেরেশতা

এই সময় মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত ফেরেশতায় ভরে ওঠবে। রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ যখন আল্লাহ পাকের বড়ত্ব, পবিত্রতা একত্ববাদের কথা বার বার উচ্চারিত হয় তখন মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত ফেরেশতা আর ফেরেশতায় ভরে ওঠে এবং ফেরেশতারা এই ঘোষণা দিতে থাকে,

هَلُمُّوْٓا اِلٰى حَاجَتِكُمْ

নিজের প্রয়োজনের প্রতি এগিয়ে এসো!

সম্মানিত বন্ধুগণ! ফেরেশতারা বলবে, আমরা পার্থিব জগতেও তোমাদের সঙ্গে ছিলাম, পরকালেও তোমাদের সঙ্গে থাকব। অধিকন্তু পরকাল ও জান্নাতে মানুষ কি পাবে? ইরশাদ হচ্ছে,

وَلَكُمْ فِيْهَا مَاتَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَاتَدَّعُوْنَ ـ (پاره/٢٤)

'তোমাদের যা মন চাইবে, তাই তোমরা সেখানে পাবে। যা তোমাদের ইচ্ছে হবে তাই সেখানে প্রাপ্ত হবে।' কারণ, তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ইচ্ছার জন্যে নিজেদের ইচ্ছাকে বিসর্জন দিয়েছ।

তোমাদের সন্তুষ্টিকে আমার তরে বিসর্জন দাও

কোন ব্যক্তি যদি নিয়মতান্ত্রিকভাবে দশ মণ শস্যদানা বিসর্জন দেয় তার বিনিময়ে একশ মণ শস্যদানা লাভ করে। আমের একটি বীচি বিসর্জন দিলে বিনিময়ে একটি পূর্ণাঙ্গ আমবৃক্ষ পাওয়া যায়।

বস্তুগত এই ধরনের প্রতিফলের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা আত্মিক বিসর্জন ও প্রতিফলের প্রতি পথ নির্দেশ করেছেন। আহ্বান করেছেন, তোমরা যদি আমার সন্তুষ্টির জন্যে নিজেদের সন্তুষ্টিকে বিসর্জন দাও তাহলে তোমাদের যা ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির বিষয় হবে তাই প্রাপ্ত হবে।

জান্নাতের নেয়ামত

সর্বাধিক ছোট যে বেহেশতের অধিকারী কোন ব্যক্তি তার পরিসর হবে দশটি দুনিয়ার সমান। তার মধ্যে থাকবে সত্তর জন রূপসী জীবনসঙ্গিনী। হাজার হাজার সেবক-সেবিকা। বেহেশতের মাটি হবে জাফরানের মত সৌরভে সুবাসিত আমোদিত। বেহেশতের পাথর কংকরগুলো হবে 'হিরা-জহরতের। সোনা-রূপার ইট হবে। অট্টালিকা তৈরির মশলা হবে মিশক। বেহেশতে প্রবেশকারী নারী-পুরুষদের বয়স হবে ত্রিশ-তেত্রিশ বছর। কেউ লক্ষ-কোটি বছরেও বার্ধক্য পাবে না। মৃত্যুও থাকবে না কোনদিন। তাদের পরিধেয় কখনো অপরিচ্ছন্ন হবে না। ভক্ষিত খাবার পেটের মধ্যে ময়লা কিংবা দুর্গন্ধের সৃষ্টি করবে না।

আমি যদি বেহেশতের আলোচনা আরও দীর্ঘ করি তাহলে বেহেশতের খুব আকর্ষণ সৃষ্টি হবে, পক্ষান্তরে জাহান্নামের আলোচনা সবিস্তারে নিবেদিত হলে জাহান্নামের প্রতিও ভীষণ ভয় সৃষ্টি হবে। কিন্তু এতেই তখন আলোচনার সকল সময় শেষ হয়ে যাবে। তখন আর জাহান্নাম থেকে

বাঁচার এবং জান্নাতে প্রবেশ করার সমূহ প্রস্তুতি সম্পর্কে কথা বলার সময় থাকবে না। অথচ এটাই বেশী প্রয়োজনীয়। তাই আমরা এ সম্পর্কে আর অধিক ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না। বেহেশতের প্রতি কিছুটা আকর্ষণতো সৃষ্টি হয়েছেই, ভীতিও সৃষ্টি হয়েছে যৎসামান্য জাহান্নামের প্রতি। এই পৃথিবীতে আমাদের করণীয় কি এ সম্পর্কে কিছু কথা নিবেদন করছি।

আল্লাহ্ তায়ালার আতিথেয়তা

ফেরেশতারা ঘোষণা করবে, তোমাদের যা ইচ্ছা হবে তাই তোমরা এখানে প্রাপ্ত হবে। তোমরা যা উচ্চারণ করবে তাই প্রস্তুত পাবে। পরম করুণাময়ের পক্ষ থেকে আতিথেয়তা স্বরূপ। আর মালিক তার মনমত আতিথ্যের ব্যবস্থাও করে আবার অতিথির চাহিদা পূরণেরও ব্যবস্থা করেন। অধিকন্তু অতিথি চায়নি এমন অনেক কিছুরও আয়োজন করেন ব্যবস্থাপক নিজের পক্ষ থেকে। হরেক রকমের নিয়ামত পর্যায়ক্রমে বিচিত্র রঙ-রসে উপস্থিত হতে থাকবে।

তিনি এমনসব নিয়ামতের আয়োজন করবেন যা কোন চোখ কোন দিন দেখেনি, কোন কর্ণকূহরে যার নাম পৌঁছায়নি। এমনকি যা কোন মানুষের কল্পনায়ও আসেনি। এ হলো পরম করুণাময়ের পক্ষ থেকে জান্নাতীদের জন্যে অপার আতিথ্য।

যাদুকরদের ঈমান ও ফিরাউনকে দাওয়াত প্রদান

মুহতারাম বন্ধুগণ!

আমি একথাও পূর্বেই উল্লেখ করেছি, যাদুকররা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, ঈমান যখন এনেছি তখন আর তা বর্জন করব না। যদি এর জন্যে শূলীতে চড়তে হয় চড়ব। তারা ফেরাউনকে বলেছিল,

فَاقْضِ مَآاَنْتَ قَاضٍ (پاره/١٦)

'তোমার যা করার আছে কর।'

অধিকন্তু তারা ফেরাউনকে দাওয়াত দিতে শুরু করল। ফেরাউনকে দাওয়াত দেয়ার প্রভাব উপস্থিত বিশাল জনতাকে এমনভাবে প্রভাবিত করল, সমাবেশের এক বিরাট অংশ সেখানেই কালেমা পড়ে মুমিন হয়ে গেল। ঈমানের সুবাতাস ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে।

ফেরাউনের ঔদ্ধত্য

এ সকল আয়োজন ছিল ফেরাউনের হেদায়াতের জন্যে। সে ছিল গলিত বিকৃত ও উদ্‌ভ্রান্ত। কিন্তু আল্লাহ্ তাকে আকস্মিকভাবে পাকড়াও করেননি। মানুষ যদি আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির কাজে সক্রিয় হয়ে পড়ে তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহ্ তায়ালা তাকে পাকড়াও করেন না। বরং তাকে পরিশুদ্ধির পথ করে দেন। সে মতে ফেরাউনের মুক্তির পথও রচনা করেছিলেন। সে পথ ধরে তার জীবন সঙ্গীনী পর্যন্ত আলোর ভুবনে বেরিয়ে এসেছিল। ঈমানের আলোয় উদ্ভাসিত আছিয়া (রাঃ) মুসলিম মিল্লাতের পরিচিত একজন। ঈমানী কাফেলার এক মহান তাপসী।

কিন্তু এতকিছু ঘটে যাওয়ার পরও ফেরাউনের টনক নড়েনি। যেই সেই এর প্রতিধ্বনি হয়ে রয়েছে তার অন্ধজীবন। মানুষ যখন বক্রতা ও ঔদ্ধত্যে মজে যায় তখন শত উপলব্ধি-অনুভব তাকে নাড়াতে পারে না। সে তার মত ও পথ ছাড়ে না। তখন তার উপর এমন প্রচন্ড আঘাত আসে এবং তখন আর উপায়ান্তর থাকে না। কথায় আছে, 'লাথির ভূত কথায় যায় না'। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত তার উপর শক্ত পেটাই না পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত সে কথা মানে না, বুঝে না।

মূসা তোমার প্রভুকে ডাক

কী আর করার! এই সভা সমাপ্ত হলো। তারপর সে তার দরবার বসালো। দরবার ডেকে হেদায়াত কবুল না করে ঔদ্ধত্যপূর্ণ দর্পে ঘোষণা করল, 'আমাকে ছেড়ে দাও! আমি মূসাকে হত্যা করব! আর মূসা তার খোদার কাছে সাহায্য চাইবে। দেখা যাক শেষে কি হয়! এরা দোয়ার ভয় দেখায় । দেখে নাও দোয়ায় কি হয়?'

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْٓ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ (پاره/٢٤)

ফেরাউন বলল ঃ 'আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করব! আর সে যেন তার প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে।' ফেরাউন মনে করত, দোয়ার দ্বারা কিছুই হয়না। এসব অনর্থক। আমি এ কথা বার বার বলছি, বিশেষ কারণে মুসীবত যদি নাও আসে তবুও একথা মনে করার অবকাশ নেই যে বিপদ আসবে না। বিপদ অবশ্যম্ভাবী! আল্লাহর পাকড়াও অবধারিত। কিন্তু আল্লাহর এটা অসীম অনুগ্রহ, তিনি হেদায়াতের আসবাব-উপকরণের আয়োজন করেন– যেন বান্দা হেদায়াত পেতে পারে। মৃত্যুর পর যেন

মহাসংকটময় শত বিপদ থেকে বেঁচে যেতে পারে। এটা তাঁর একান্ত এহ্সান।

ফেরাউন আল্লাহর সাথে কত অশুভ আচরণ করেছে, কত অন্যায় অবিচার করেছে। রাগ ও ক্রোধ সঞ্চারক অসংখ্য কর্মকান্ডের পরও তিনি তাকে পাকড়াও করেননি। অবশেষে সে নবীকে হত্যা করার অঙ্গীকার করেছে। বলেছে, আমাকে ছেড়ে দাও! মূসাকে হত্যা করে ফেলব। সে দোয়া করুক! দেখি তার দোয়ায় কি হয়?

কবুলিয়্যাতের অঙ্গীকার

বন্ধুরা! দোয়ার বিষয়টি হলো এমন,

اُدْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

'তোমরা আমার কাছে প্রার্থনা কর। আমি তোমাদের প্রার্থনা কবুল করব।' এটা আল্লাহ তায়ালার অঙ্গীকার। তবে শর্ত হলো, দোয়া কবুলের অন্তরায় কোন কিছু থাকতে পারবে না।

দোয়া কেন কবুল হয় না

দোয়া কবুলে অন্তরায় সৃষ্টি করে এমন কিছু বিষয় আছে। যেমন হারাম খাবার ভক্ষণ করা। আলস্যচিত্তে দোয়া করা। এতে করে দোয়া কবুল হয় না।

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبَلُ الدُّعَاءَ عَنْ قَلْبٍ لَاهٍ

'আল্লাহ তায়ালা অমনযোগীর দোয়া কবুল করেন না।' অত্যন্ত মনোযোগ ও গভীর একাগ্রতার সাথে দোয়া করা উচিত। কায়মনোচিত্তে রাতের শেষ প্রহরে দোয়া করা উচিত। রাত যখন গভীর হয়, পিনপতন নীরবতায় ছেয়ে যায় সমগ্র প্রকৃতি, তখন জেগে থাকে আল্লাহর বান্দারা, জেগে থাকেন আল্লাহ। যখন আল্লাহ পরম করুণাসহ নিবিষ্ট থাকেন বান্দার প্রতি তখন আল্লাহর কাছে চাওয়া উচিত। দিনেও চাওয়া দরকার। এখানে আলসেমী অবাঞ্ছিত। তবে চাইতে হবে গভীর একাগ্রতায়। এক কথায় দোয়া কবুলিয়্যতের জন্যে হালাল রুজী ও একাগ্রতা একান্ত শর্ত।

দাওয়াতের কাজ বর্জন করা

দোয়া কবুল না হওয়ার অন্যতম কারণ--------

সহজভাবে বলতে গেলে তৃতীয় কারণটি হল, দাওয়াতের আমল বর্জন করা। এ কারণে দোয়া কবুল হয় না। এটা আমার কথা নয়। আল্লাহর রাসূল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مُرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ.....الخ

'সৎ কাজের আদেশ কর, অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখ'। দাওয়াতের কাজ কর। তোমাদেরকে যেন এমন দিন পেয়ে না বসে যে, তোমরা দোয়া করবে আর তা কবুল হবে না।' সুতরাং বুঝা গেল, দাওয়াতের কাজ ছেড়ে দিলে দোয়া কবুল হয় না।

ঘাবড়াবার কিছু নেই

তবে আমি একটি কথা বলছি। আপনাদের ভয় পাবার কিছু নেই যে, আমাদের তো খাবারও হারাম, কাপড়ও হারাম আর দাওয়াতের কাজ তো করিইনা। কাজেই আমাদের দোয়া কবুল হবে না। তাহলে দোয়া করে লাভ কি?

অন্তত সিদ্ধান্ত করুন

মুহতারাম বন্ধুগণ! আমাদের জন্য এই মুহূর্তে খানা-পিনা, বস্ত্র-পরিধেয় হালাল করে ফেলাতো কঠিন। তবে আমার নিয়্যত করতে পারি, এই মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিতে পারি আমাদের হারাম খাবার ও পরিধেয়কে হালাল বানাতে সচেষ্ট হব। এতটুকু তো অবশ্যই করতে পারি। সুতরাং নিয়্যত করে ধীরে ধীরে চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারি।

তাছাড়া দাওয়াতের কাজকে আমরা নিজের করণীয় হিসেবে গ্রহণ করিনি বলে আমাদের দোয়া কবুল হবেনা ভেবে দোয়া করা ছেড়ে দেয়ারও যুক্তি নেই। আমরা বরং সংকল্প করে নেই, আমরা দাওয়াতের কাজকে নিজেদের কাজ বানাব। অতঃপর চেষ্টা চালিয়ে যাই। চেষ্টারও এই অর্থ নয় যে এক মুহূর্তে সবকিছু বর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়ব। বরং ধীরে ধীরে এগিয়ে যাব এটাইতো উত্তম। সুতরাং এভাবে নিয়্যত করার পর আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে থাকব। আল্লাহর দরবারে প্রাণখুলে প্রার্থনা করব। দোয়া করব দাওয়াতী কর্মে উন্নতি অগ্রগতির জন্যে, নিজেদের পোশাক-পরিধেয় ও খানা-পিনা হালাল করার জন্যেও।

বান্দার স্বার্থের প্রেক্ষিতে

মনে রাখতে হবে, দোয়া কবুলিয়্যতের ব্যাপারে একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে, এক ঈদের দিনে আমাদের হযরতজী হযরত মাওলানা এনামূল হাসান (রহঃ) তাঁর আলোচনায় বলেছিলেন: পরকাল সম্পর্কে বান্দা যা প্রার্থনা করে আল্লাহ তায়ালা তাকে তাই দান করেন। কিন্তু পার্থিব বিষয়ে বান্দা যা প্রার্থনা করে তার স্বার্থ ও কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখেই তাকে প্রদান করা হয়।

দোয়া কবুল হওয়ার পাঁচটি স্তর

এখানে মনে রাখতে হবে, পার্থিবতা সম্পর্কে বান্দাকে প্রার্থনা করে তার কবুলিয়্যতের ক্ষেত্রে পাঁচটি স্তর আছে।

প্রথম স্তর

বান্দার প্রার্থনীয় বিষয়টি যদি তার জন্যে কল্যাণকর হয়, তার স্বার্থমাফিক হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহ কবুল করে নেন। রাতে যা প্রার্থনা করেছে প্রভাতেই তা পেয়ে যায়। আপনাদের অনেকেও হয়তো এমন ঘটনা প্রত্যক্ষ করে থাকবেন যে, এক বান্দা রাতে আল্লাহর কাছে তার প্রয়োজনীয় কিছু কামনা করেছে, সকালেই তা প্রাপ্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় স্তর

দ্বিতীয় স্তর হলো – বান্দা যা প্রার্থনা করেছে তা তার জন্যে কল্যাণকর ও সমীচীনও বটে। কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে দেয়াটা কল্যাণকর নয়। বরং বিলম্বে দেয়ার মধ্যেই নিগূঢ় কল্যাণ নিহিত আছে। আল্লাহ তাঁর বান্দা যা চেয়েছে তাই দেন। তবে ধীরে ধীরে দেন। কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে দেন। অশ্রুবন্যায় ভাসিয়ে তারপর দেন। কারণ বান্দার কান্না-কাটি আল্লাহর দরবারে খুবই প্রিয়। বান্দার প্রয়োজন মিটে গেলে আর কাঁদবে কে? বান্দার ক্রন্দনরত বিনিদ্র রজনী যাপন আল্লাহর দরবারে খুবই প্রিয়। বান্দা যখন রাতের গভীরে বিড়বিড় করে কাঁদে, দু'হাত তুলে কাচু-মাচু করে, তখন পরম করুণাময় আল্লাহ খুবই খুশী হন। আমি মনে করি, আমাদের হাজার কর্মসিদ্ধির চাইতে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও খুশীলাভ অনেক উত্তম। তাঁর এই খুশীর প্রেক্ষিতেই মাঝে মধ্যে আমরা যা চাই তা বিলম্বে প্রাপ্ত হই।

তৃতীয় স্তর

বান্দা কখনও কখনও এমন কিছু চেয়ে বসে যা তার জন্যে কল্যাণকর নয়। তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে তা দান করেন না। বরং যা তার জন্যে কল্যাণকর তাই দান করেন। আর বান্দার জন্যে কি কল্যাণকর তা আল্লাহ্ই সবচে' ভাল জানেন। সুতরাং যা সে প্রার্থনা করেছে তা না দিয়ে তার কল্যাণকর জিনিস দেয়াটাও দোয়া কবুল হওয়ারই শামিল। হযরত মরিয়ম (আঃ)-এর জননী আল্লাহ্র দরবারে কামনা করেছিলেন একজন পুত্র সন্তান। বায়তুল মুকাদ্দাসের সেবা করার জন্যে। কিন্তু আল্লাহ দিলেন কন্যা সন্তান। মা খুব চিন্তিত হলেন। কন্যা কিভাবে বায়তুল মুকাদ্দাসের সেবা করবে!

لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثٰى (پاره/٣)

'আর কন্যার দ্বারা যা হবে পুত্রের দ্বারা তা হবার নয়।'

চতুর্থ স্তর

কখনো বান্দা যায় চায় তা পায় না। সে আল্লাহর কাছে পার্থিব কিছু কামনা করে কিন্তু আল্লাহ তার কল্যাণার্থেই তা দেন না। বরং তার প্রতিধাবিত অত্যাসন্ন কোন বিপদকে দূর করে দেন। কারণ এই বিপদকে দূর করে দেয়াটাই তার জন্যে উত্তম। যদি তাকে তার প্রার্থনীয় বস্তুটিও দেয়া হত এবং বিপদেও ফেলা হত তাহলে যা পেত তা ওই বিপদের মধ্যেই শেষ হয়ে যেত। অধিকন্তু পূর্বপ্রাপ্ত যা ছিল তাও হারিয়ে যেত বিপদের তোড়ে। আর অবিরাম অস্থিরতা বিচলতা তো পোহাতে হতোই। এটা আল্লাহ তায়ালার অসীম দয়া ও অনুগ্রহ। তিনি কখনো কখনো বান্দার কামনীয় বস্তুটি না দিয়ে তার পরিবর্তে তার অত্যাসন্ন বিপদকে ফিরিয়ে দেন।

একটি উপমা

মনে করুন, আপনার তিনটি ছেলে আছে। তিনজন পুত্রবধূও আছে। থাকার ঘর আছে মাত্র দুটি। উপার্জনের উপায়– দোকানও আছে দুটি। আপনার কামনা হলো, আপনার মৃত্যুর পূর্বেই যেন তৃতীয় পুত্রের জন্যে একটি ঘর ও একটি দোকানের ব্যবস্থা হয়ে যায় এবং আপনি তার আয়োজনও করছেন। আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটিও করছেন। কিন্তু তৃতীয় ঘর ও দোকানের ব্যবস্থা হচ্ছে না।

মনে করতে হবে, হতে পারে উপর থেকে কোন বিপদ আমার ছিল। দোয়ার কারণে সে বিপদকে আল্লাহ তায়ালা রুখে রেখেছেন প্রার্থনীয় দোকান ও ঘরের পরিবর্তে। যদি ঘর দোকান দান করতেন সাথে সাথে বিপদকেও আসতে দিতেন–পরিণামে সেই বিপদের ঝাপটায় তিনটি দোকান ঘরই ধ্বংস হয়ে যেত।

সুতরাং এটা আল্লাহর অনুগ্রহ। তিনি ঘর-দোকানের পরিবর্তে বিপদকে আটকে রেখেছেন। এতে ঘাবড়াবার কিছু নেই। সামান্য কষ্ট করলেন। বেঁচে গেলেন বিরাট ধ্বংসের হাত থেকে।

এখনতো আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্যে জীবনকে আরও সহজ করে দিয়েছেন। এ ধরনের সংকটের ক্ষেত্রে এক পুত্রবধূসহ আল্লাহর রাস্তায় চলে যাবে। সে আসার পর দ্বিতীয় জন যাবে। এভাবে দুই ঘরের মধ্যেই জীবন যাপনও হয়ে যাবে, দ্বীনের দাওয়াতের কাজও সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে হেদায়াতের প্রোজ্জ্বল আলো।

পঞ্চম স্তর

বান্দা যা কামনা করেছে আল্লাহ তা দেননি। বরং সংরক্ষণ করে রেখে দিয়েছেন পরকালের জন্যে। কিয়ামতের দিন খুব সুন্দর ও উত্তমরূপে তা দান করবেন। মান ও পরিমাণে সমৃদ্ধ হবে সে দাম।

কিয়ামতের দিন এই প্রাপ্তির পর বান্দা আশা করবে, আকাঙ্ক্ষা করবে পৃথিবীতে যতকিছু চেয়েছিলাম সবই যদি পরকালের জন্যে সংরক্ষিত থাকত, তাহলে কত ভাল হত! কারণ, পৃথিবীতে যা পেয়েছি তাতে মৃত্যুর সময় সবই হাতছাড়া হয়ে গেছে।

সারকথা, এই পাঁচটিই আল্লাহর দরবারে দোয়া কবুল হওয়ার পদ্ধতি।

ফেরাউনের ভুল চিন্তা

সম্মানিত বন্ধুগণ। ফেরাউন ভেবেছিল, মূসা (আঃ) দোয়া করবে! দেখি কি দোয়া করে! আর দোয়ার দ্বারা ঘটারই বা কি আছে! যারা গলিত বিকৃত তাদের ভাবনা এমনই হয়। তারা মনে করে এরা এত দোয়া করে ফিরছে কই? কিছুই তো হচ্ছে না এদের। কোন কামনাইতো পূরণ হচ্ছে না। অথচ তারা জানেনা, দোয়া কবুল হওয়ার অনেক স্তর রয়েছে। যেমন পাঁচটি স্তর আমরা এইমাত্র উল্লেখ করেছি।

ফেরাউন মনে করত দোয়া বুঝি কবুল হয় না। তাই সে বলল, 'আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করে ফেলব। আর সে পারলে তার প্রভুর কাছে দোয়া করুক।'

এটা এতবড় স্পর্ধা – অপরাধ যার পাকড়াও সঙ্গে সঙ্গেই হতো। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা একটু সময় দিয়েছেন। হেদায়াতের সমূহ পাথেয় করে দিয়েছেন। তার সভাসদদের একজন একথা শুনেই দাঁড়িয়ে গেল এবং ফেরাউনের দরবারেই দাওয়াত দিতে শুরু করল। সে পূর্ব থেকেই মুমিন ছিল। কোন দ্বীনী স্বার্থেই এ পর্যন্ত ঈমানকে গোপন করে রেখেছিল। কিন্তু যখন দেখল, মূসা (আঃ)-কে হত্যার চেষ্টা হচ্ছে, তখন সঙ্গে সঙ্গেই সকণ্ঠ দাঁড়িয়ে গেছে।

ফেরাউনের দরবারে এক সভ্য-মুমিনের ভাষণ

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗۤ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ (پاره/٢٤)

'ফেরাউনের বংশোদ্ভূত এক মুমিন বলে ওঠল, তোমরা কি এমন একজন লোককে হত্যা করতে চাও, যিনি বলেন, আল্লাহ আমার রব? অথচ তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে দলীল-প্রমাণ নিয়ে এসেছেন।'

সে খুব শক্তির সাথে এই ভাষণ প্রদান করল। পেছনের ঘটনাবলীও উপস্থাপন করল। ভবিষ্যত কিয়ামতের কথাও বলল। ইউসূফ (আঃ)- এর যুগের কথা, পার্থিব জগতের নশ্বরতা, মূল্যহীনতা ও পরকালের মহান গুরুত্বের কথাও বাদ পড়েনি তার বক্তৃতায়। সকল কথাই সে ধীর গম্ভীর কণ্ঠে শুনিয়ে দিয়েছে।

ফেরাউনও উপবিষ্ট ছিল। হামানসহ সকল পার্লামেন্ট সদস্যই উপস্থিত ছিল। কান পেতে সকলেই শুনেছে তার অমূল্য ভাষণ। সে তার ভাষণের শেষে এই বলে ইতি টানল,

فَسَتَذْكُرُوْنَ مَاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ وَاُفَوِّضُ اَمْرِىْۤ اِلَى اللّٰهِ- اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ (پاره/٢٤)-

'আমি তোমাদেরকে যা বলছি তা শীঘ্রই স্মরণ করবে তোমরা। আমি আমার সবকিছু আল্লাহর কাছে সোপর্দ করছি। নিশ্চয় আল্লাহ বান্দাদের সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।'

অর্থাৎ, তোমরা আমার কথা মনে রেখ! পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোকে তিনি যেভাবে ধ্বংস করে দিয়েছেন তোমাদেরকেও সেভাবেই ধ্বংস করবেন। অবশেষে তোমাদেরকে জাহান্নামে যেতে হবে। আমার কথাগুলো তখন খুব মনে পড়বে। সকল কিছুই আল্লাহর হাতে।

আল্লাহর অপার শক্তি ও মহিমার কথা বীর্যপূর্ণ ভঙ্গিতে বলে দিল এক মর্দে মুমিন। আমাদেরকেও আল্লাহর ক্ষমতা, শক্তি ও মর্যাদার কথা বলে যেতে হবে।

আল্লাহ মহান ক্ষমতাশীল

আল্লাহর ক্ষমতা অসীম। অফুরন্ত শক্তিমান। তাঁর শক্তির তুলনায় পৃথিবীর সকল শক্তি মাকড়সার জালের মত, এর কোনই মূল্য নেই। তুলনা নেই। তাই ফেরাউন, হামান ও কারূণের শক্তি মাকড়সার জালের মতই ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে। আদ ও ছামূদ গোত্রের বীর্য-বিক্রম হারিয়ে গেছে একই কায়দায়। ভবিষ্যতে দজ্জাল ও ইয়াজুজ-মা'জুজের বাহিনীও হারিয়ে যাবে একই স্রোতে।

মাকড়সা কখন জাল বানায়

ঘর যখন বিরাণ হয়ে পড়ে মাকড়সা তখন জাল বানায়। আবাদ ঘরে মাকড়সা জাল বানায় না। আজ বিশ্বময় মাকড়সাদের জাল বানানোর যে মহড়া চলছে, তা শুধু এই কারণে যে পৃথিবী এখন দ্বীনী দাওয়াত শূন্য হয়ে পড়েছে। শিক্ষার আলো থেকে বিরাণ হয়ে পড়েছে। পৃথিবীতে আজ আল্লাহর যিক্‌র নেই, নববী চরিত্র নেই।

সাদা-কাল নয়, ভিত্তি হবে ঈমান

আজ ঈমানদারদের উচিত ঈমানের ভিত্তিতে একে অপরের প্রতি সম্মান ও ইকরামপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে একতা ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করা। ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা। বংশগত, বর্ণগত, জাতিগত বিভেদ ঝেড়ে ফেলা উচিত। এসব অবাঞ্ছিত বিভেদ প্রাচীর অতিক্রম করে যতটা ঈমানী ঐক্য সৃষ্টি হবে ততটাই আল্লাহর সাহায্য নসীব হবে। ইরশাদ হচ্ছে,

وَلَاتَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ (پاره/ ١٠)

'পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। তাহলে শক্তি চলে যাবে। তোমরা হয়ে পড়বে দুর্বল।'

অনৈক্য থেকে বাঁচ

আপোষে বিবাদ করোনা। অন্যথায় দুই ধরনের বিপদে আক্রান্ত হবে।

১. দুর্বল হয়ে পড়বে। ২. অন্যদের ভেতর থেকেও তোমাদের ভয় চলে যাবে। এটা আল্লাহর কথা।

নিজের সংসারেও ঝগড়া-বিবাদ এড়িয়ে চলবে। জাতি, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী এমনকি সকল দ্বীনী কর্মেও বিবাদ এড়িয়ে চলবে। দ্বীনী কাজের ক্ষেত্রেও 'এ এভাবে করছে–সে ওভাবে করছে' বলে অন্যের ত্রুটি অন্বেষণ করা উচিত নয়। আজতো সকলেই অন্যের ত্রুটি-বিচ্যুতির পর্যালোচনা করে লেখছে-বলছে। সকলেই সকলের বিরুদ্ধে। অথচ এমনটি মোটেই কাম্য নয়। আল্লাহ বলছেন ঃ 'তোমরা পরস্পরে বিবাদ করোনা। তাহলে দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের 'বাতাস' (অন্যদের ভেতর থেকে তোমাদের ভয়) চলে যাবে।'

সারকথা, পৃথিবী যখন সৎচরিত্র, নিষ্ঠা-এখলাস ও দ্বীনী দাওয়াত থেকে শূন্য হয়ে পড়ে, বিরাণ হয়ে পড়ে যখন এসব সত্য-সুন্দর বাসিন্দা থেকে, তখনই মাকড়সা জাল বানাতে শুরু করে।

মাকড়সার অহংকার এবং পরিণতি

বিরাণ-শূন্য ঘরে যেভাবে মাকড়সা জাল বিস্তার করে, কপোতীরা বাসা তৈরি করে, ডিম্ব ছাড়ে বাসার ছিন্ন খড়– কূটায়, ডিমের খোসায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে ঘর; হারিয়ে যায় শ্রী-সৌন্দর্য, তখন মাকড়সা মহা আনন্দে হুমড়ি খায়। কত খড়, কত খোসা আমার জালে ছুটে পড়ছে জাল ছিন্ন হচ্ছে না। সে তখন তার জালে ওঁত পেতে বসে থাকে। ছোট-খাট পোকা-মাকড় যখন পাশ দিয়ে যায় হামলা করে শিকার করে খায় আর মহাদর্পে নেচেখেলে নাদুস-নুদুস হয়ে ওঠে। মনে মনে সে তখন কর্মসূচী তৈরি করে নেয় – এদিকে ওদিকে সদর্পে ছুটাছুটি করে।

এই লাফা-লাফি দেখে তাদের পুরুষ বন্ধুরাও নেমে আসে। ঘর তৈরি করে। মাকড়-মাকড়ীর খেল-তামাশায় পুরো ঘর ছেয়ে যায় জ্বালা-যন্ত্রণায়।

পৃথিবীর সকল শক্তিই মাকড়সার জাল

আল্লাহর কসম! দুনিয়ার সকল শক্তিই মাকড়সার জালের মত। আল্লাহর শক্তির সামনে এগুলোর কোনই মূল্য নেই। এই পৃথিবীকে যদি দ্বীনের

আলোয় উদ্ভাসিত করা যায়, ইনসানিয়্যাত প্রভায় আলোকময় করা যায়, প্রোজ্জ্বল করা যায় নেক আমলের বিমল কিরণে, তাহলে আল্লাহ তায়ালা এই মাকড়সার জালগুলো সাফ করে দিবেন। দুনিয়া হয়ে ওঠবে পরিচ্ছন্ন। এটা আমার কথা নয়, আল্লাহর কথা। ইরশাদ হচ্ছে,

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ اِتَّخَذَتْ بَيْتًا- وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ لَوْكَانُوْا يَعْلَمُوْنَ (پاره/ ٢٠)

'যারা আল্লাহ ব্যতীত অভিভাবক গ্রহণ করেছে তাদের তুলনা সেই মাকড়সার মত যে একটি ঘর তৈরি করেছে। নিশ্চয় সবচাইতে দুর্বল ঘর–মাকড়সার ঘর– যদি তারা জানতো।'

মুহতারাম বন্ধুগণ! যে ব্যক্তি কোন ঘরকে পরিষ্কার করতে চায় সে সর্ব প্রথম ঘরে জাল-জঞ্জাল পরিষ্কার করে। তাছাড়া জাল পরিষ্কার করতে বিশেষ সময়েরও প্রয়োজন হয় না। একটি ঝাড়ু হাতে নিয়ে ডানে-বামে ঘুরিয়ে আনলেই জালও খতম, মাকড়ও খতম।

আযাবের এক ঝাড়ুতে ফেরাউনের রাজত্ব শেষ

হেদায়াতের যাবতীয় উপকরণ থাকা সত্ত্বেও সে সরল পথে আসেনি। বরং অন্যায় পথে গোঁড়ামী ও অহংকারবোধে ছিল প্রতিষ্ঠিত। অতঃপর আল্লাহ পাক যখন মিসরকে দ্বীনের আলোয় আলোকিত করার ইচ্ছা করলেন এবং এও দেখলেন এই দর্পী অহংকারী কথা মানবে না, তখন তাকে অপারেশন করা ছাড়া বিকল্প ছিল না। আল্লাহ তখন বিষ ফোঁড়াটা পৃথিবীর দেহ থেকে আলাদা করে ফেলা অনিবার্য, তখন আল্লাহ তায়ালা আযাবের ঝাড়ুর একটি সঞ্চালনে ফেরাউনী রাজত্বের অন্ধ জাল পরিষ্কার করে ফেললেন।

দেশ ও মন্ত্রীত্বের আবর্জনা সাফ

আযাবী ঝাড়ুর দোসরা সঞ্চালনে মন্ত্রী হামানের কিস্সাও খতম। তৃতীয় সঞ্চালনে কারূণের ধন-দৌলত সহ বিদায়। এসব মাকড়সার জাল পরিষ্কার করে আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা (আঃ) ও বনী ইসরাঈলের জন্যে মিসরকে দ্বীন বাস্তবায়নের সম্পূর্ণ উপযোগী করে দেন।

আল্লাহর 'ধরা' বড় কঠিন

মহান আল্লাহ আজও সেই পরাক্রমশীল শক্তিতেই বিরাজমান। আমরা

সারা পৃথিবীকে বলি, আল্লাহর শক্তিকে মেনে নাও। যদি আল্লাহর শক্তিকে না মান, যদি তাঁর ক্ষমতার সামনে আত্মসমর্পণ না কর তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদেরকে ছেড়ে দিয়ে রাখবেন, ততক্ষণ হয়তো তোমরা টেরও পাবে না। কিন্তু যখন আল্লাহ'র পাকড়াও আসবে তিনি যখন ধরবেন, তাহলে ভাল করে শুনে নাও – হে পৃথিবীর সকল সম্রাজ্যের অধিকারী ও ঐশ্বর্যশীলগণ! আল্লাহর পাকড়াও থেকে কেউ নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না।

তাই আমি বলি, সারা পৃথিবীতে জামাত নিয়ে ঘুরে ফিরুন! সর্বত্র সকল বনি আদমকে জানিয়ে দিন আল্লাহর শক্তির কথা। পৌঁছে দিন সকলের কর্ম কূহরে তাঁর অপার ক্ষমতার কথা!!

আমরা দুর্বল

আমরা এক অপার শক্তিধর আল্লাহর অনুগত। আমরা কোন শক্তির দাবীদার নই। আমাদের কোন শক্তি নেইও ।

خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا

মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই দুর্বল। আমরা আমাদের দুর্বলতা স্বীকার করি।

আল্লাহ'র ভান্ডারে কোন কিছুর অভাব নেই

সকল শক্তির মালিকতো আল্লাহ। তাঁর শক্তি এত বেশি, দেখুন তিনি একটি মাত্র আদেশ দিয়েছেন আর কত বড় আসমান-জমিন সৃষ্টি হয়ে গেছে। তাঁর শক্তি এত বিশাল, প্রতিদিন তিন লক্ষেরও বেশি শিশু সৃষ্টি করে পৃথিবীতে পাঠান। প্রতিটি শিশুকে দুটি চোখ দেন। এভাবে দৈনিক ছয় লক্ষ চোখ সৃষ্টি করেন। অথচ তাঁর ভান্ডারে অভাব নেই। প্রতিটি মানুষের আকৃতি আলাদা। আওয়াজ ভিন্ন। স্বভাব ও আবেগ স্বতন্ত্র। অথচ তাঁর ভান্ডারে অপ্রতুলতার অভিযোগ নেই।

আমাদের দায়িত্ব আল্লাহর শক্তি ও তাঁর শক্তির ভান্ডারের কথা মানুষের কাছে বর্ণনা করা। সারা জগতের মানুষের কাছে বলতে হবে, খুসূসী গাশ্‌তে বলতে হবে, উমূমী গাশ্‌তে বলতে, তবে গোছালোভাবে বলতে হবে। সুবিন্যস্তভাবে দাওয়াতের সকল ক্ষেত্রেই বলতে হবে। অগোছালোভাবে বললে মানুষ আল্লাহ' পাককে (নাউযুবিল্লাহ) ঠাট্টা করবে। এই ঠাট্টাবাজির কারণ হব তখন আমরা। সাফ কথা, অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে

দাওয়াত দিয়ে যেতে হবে। এজন্যে প্রশিক্ষণ নিতে হবে। জামাতের সাথে ঘুরতে হবে। মাকামী কাজ গভীর গুরুত্বসহ নিয়মিত করতে হবে। বলিষ্ঠ কণ্ঠে নির্ভিকচিত্তে ঘোষণা করতে হবে– আল্লাহর শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ কর।

আল্লাহর বড়ত্বের কথা

قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ

'ওঠ, আল্লাহ সম্পর্কে সতর্ক কর এবং তোমার প্রভুর বড়ত্ব বর্ণনা কর।' আযানের মধ্যেও আল্লাহর বড়ত্ব, ইকামাতের মধ্যেও আল্লাহর বড়ত্ব। নামাযের মধ্যেও বারবার 'আল্লাহু আকবার' আল্লাহ সবার বড়।

জানাযার নামাযে চারবার আল্লাহু আকবার। নবজাত শিশুর ডান কানে আযান, বাম কানে ইকামাত। জন্মের সাথে সাথেই কর্ণকুহরে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়। প্রাণী জবাই করার সময় 'বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহু আকবার।' ঈদের দিনের আগমনে 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হাম্‌দ।'

অর্থাৎ ঈদের দিনেও আল্লাহু আকবার-আল্লাহ সবার বড়, জানাযার নামায, বাচ্চার জন্মলগ্ন সর্বদাই আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা-আল্লাহু আকবার। ফজর নামায থেকে শুরু হয় এই গুরুগম্ভীর উচ্চারণ। রাত্রে শোবার সময় পাঠ করি তাসবীহে ফাতেমী। সেখানেও 'সোবহানাল্লাহ, আল্‌হামদুলিল্লাহ অতঃপর ৩৪ বার আল্লাহু আকবার।

বিশ্বময় একই ধ্বনি 'আল্লাহু আকবার'

ফিজিতে আল্লাহু আকবারের ধ্বনি ওঠে। অতঃপর চতুর্দিকে আল্লাহু আকবারের পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায়। ফিজি'র পরবর্তী দেশগুলোতে প্রতিধ্বনি ওঠে একই মহামহিম শক্তির। অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ফিলিপাইন, জাপান, কোরিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড থেকে বাংলাদেশ, বার্মা পর্যন্ত একই ধ্বনিতে জেগে ওঠে ঘুমন্ত প্রকৃতি। সর্বত্র শ্রুতিগোচর হয় আল্লাহর বড়ত্বের কথা।

সারা পৃথিবীতে আল্লাহু আকবারের আওয়াজ ওঠছে। সৌভাগ্য তাঁদের যারা সক্রিয় হবে এবং আল্লার বড়ত্ব বর্ণনায় আত্মনিয়োগ করবে।

মুহতারা বন্ধুগণ! যারা আল্লাহর বড়ত্বের সামনে আত্মসমর্পণ করে, আল্লাহর বড়ত্ব বর্ণনায় জীবন বিলিয়ে দেয় আল্লাহর সাহায্য তাদের সাথেই থাকে।

বেঈমানদের দাবী-দাওয়া

বেঈমানরা সর্বকালের নবী-রাসূলদের কাছেই বিভিন্ন দাবী-দাওয়া করেছে।

قَالُوْا رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ (پاره/ ٢٣)

'তারা বলল ঃ হে আমাদের রব, কিয়ামতের পূর্বেই আমাদের শাস্তি আনয়ন কর।' এটা বেঈমানদের দাবী ছিল। কিন্তু আযাব আসেনি। কেন আসেনি? কারণ, আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে ধরেন না। বরং তিনি হেদায়াতের নানান উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা করেন। আরও ইরশাদ হয়েছে,

اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ -(پاره/ ٩)

'যদি এই কুরআন তোমার কিতাব হয়ে থাকে তাহলে আমাদের প্রতি আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ কর অথবা কোন বেদনাদায়ক আযাব আনয়ন কর।"'

এরপরও আল্লাহর আযাব আসেনি। তারপর তারা খুব উৎপাত শুরু করে দিল। বলতে লাগল, দেখনা কিছুই হচ্ছে না, তারপর কুরআনের অনেক আয়াত অনেক সূরা অবতীর্ণ হয়। নবী রাসূলদের কিচ্ছা-কাহিনী বিবৃত হয়। এতে বলা হয়, পূর্ববর্তী নবীদের আমলেও বেঈমানরা এসব দাবী করেছে। অবশেষে আল্লাহ তাদেরকে কিভাবে ধ্বংস করে দিয়েছেন সে কথাও বর্ণিত হয়েছে। আরও বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণকারী ও আল্লাহর বড়ত্ব বর্ণনাকারীদের প্রতি আল্লাহর সাহায্যের কথা।

এসব শুনে বেঈমানরা বলত যে, 'এগুলো তো পুরনো দিনের কথা। পারলে নতুন কিছু করে দেখাও!'

আল্লাহর সাহায্য উপস্থিত

কাফেরদের এই দাবীর পরেই ঘটেছিল বদরের যুদ্ধ। আল্লাহ পাক দেখিয়েছেন, তিনি শাস্তি দিতে পারেন। সাহায্য করতে পারেন। এবার তাদের চেতনা ফিরেছে। বলতে গেলে বর্তমান পৃথিবীর অবস্থাও তাই। এসব শক্তির কথা শোনালে মানুষ বলে, আরে বদরের কাহিনী শোনায়, নবীদের কাহিনী শোনায়, ওমর (রাঃ)-এর যুদ্ধের গল্প শোনায়। এগুলো তো পুরনো যুগের কথা।

মূল কর্তা তো আল্লাহ

করার ক্ষমতা তো আমাদের নেই। প্রকৃত কর্তাতো আল্লাহ! তিনিই সব কিছু করেন। তিনিই জানেন, কতটুকু চেষ্টা সাধনার পর দ্বীনী কাজের কর্মীদেরকে সাহায্য করা হবে। কতটুকু অপরাধের পর পাপীদেরকে পাকড়াও করা হবে তাও তিনিই ভাল জানেন।

হযরত শু'আইব (আঃ)- এর কাছে দাবী

বেঈমানরা হযরত শু'আইব (আঃ)-কেও বলেছিল ঃ

فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ -(پاره/۹)

'যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে আকাশের খন্ড অবতীর্ণ করে আমাদেরকে ধ্বংস করে দাও!' উত্তরে হযরত শু'আইব (আঃ) বলেছিলেন ঃ

قَالَ رَبِّى اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

'শু'আইব (আঃ) বললেন: তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আমার প্রতিপালক ভাল জানেন।'

সম্মানিত বন্ধুগণ! কতটুকু অপরাধে কাকে পাকড়াও করা হবে, কত সাধনার পর কাকে সাহায্য করা হবে, এটা আল্লাহ ভাল জানেন। এর নিগূঢ় রহস্য, কল্যাণের দিক সম্পর্কে তিনি যথাযথ জানেন। এখানে আমাদের কোন হাত নেই। কিন্তু কোথাও যদি দু'চার বার আল্লাহর সাহায্য এসে পড়ে তাহলে 'আল্লাহ না করুন' কর্মীদের মধ্যে যেন অহংকার না আসে। বরং সার্বক্ষণিকভাবে এই ধারণা থাকা চাই, আমরা খুবই দুর্বল।

মানুষ তো এত দুর্বল যে তার দুর্বলতার কোন সীমা নেই। আর আল্লাহ কত শক্তিশালী সে কথাই আপনারা শুনছেন।

আমাদের চ্যালেঞ্জ

মানুষ এত দুর্বল, যদি লক্ষ লক্ষ মানুষ একত্রিত হয়ে হাজার হাজার বছর ধরে সমগ্র দেশের সকল সম্পদ বিলিয়ে দিয়ে সমাজ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে চেষ্টা চালায় তাহলে মাছের একটি চোখও সৃষ্টি করতে পারবে না। মাছির একটি পা তৈরী তাদের সাধ্যাতীত। সমগ্র পৃথিবীকে চ্যালেঞ্জ! সকলে মিলে একটি মশার পাখাও সৃষ্টি করতে পারবে না। কক্ষনো পারবে না।

خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا

'মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই দুর্বল।'

নিজের দুর্বলতার স্বীকৃতি দাও। আল্লাহর শক্তির সামনে মাথা নত কর। তখনই আল্লাহর শক্তি তোমার সাহায্যে নেমে আসবে। তখন উভয় জাহানেই তোমার সংকট কেটে যাবে।

আমরা চিৎকার করে করে আল্লাহর বড়ত্ব বর্ণনা করি, আর বর্ণনা করি নিজেদের অক্ষমতা। কারণ আমাদের তো কোন শক্তি নেই। আমরাতো এত দুর্বল যে, আমাদেরকে মারার জন্যে কোন পিস্তল কিংবা তলোয়ারের প্রয়োজন নেই। একটি ঘুঁষি মেরে দিলেই কুপোকাত। সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু। আমরা এত হতবল যে, নিজেদের কোন শক্তি আছে বলেই স্বীকার করি না। বলি, আমরা বলহীন, অসহায়।

আল্লাহ্ সকলেরই

আকাশ ও মৃত্তিকার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্। তিনি মুসলমান-অমুসলমান সকলেরই আল্লাহ্ । আমরা মানুষকে আল্লাহর শক্তির সামনে নতি স্বীকার করাই। আল্লাহর শক্তিকে মেনে নাও, তাহলে সব বাধা পার হয়ে যাবে। এই আওয়াজ বিশ্বময় তুলে ধরতে হবে। ক্ষেতখামার, ঘর-বাড়ি, দোকান-পাট সর্বত্র আওয়াজের নিনাদ তুলতে হবে। দাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর নাম সর্বত্র উঁচু করতে হবে। আপনাদের মনে হতে পারে, এই যে আমি চিৎকার করছি তা এখানে করে লাভ কি? চিৎকার তো করা দরকার বড় বড় রাষ্ট্র নায়কদের সামনে। এখানে বলার ফায়দা কি? আমি বলব, আমাদের সামর্থ যতটুকু আমরা তা করে যাব। শক্তি মাফিক আল্লাহর নাম বুলন্দ করব। গাশ্‌তে , খুসূসী গাশতে সর্বত্র আল্লাহর নাম বুলন্দ করতে সচেষ্ট হব। যেখানে আমাদের সামর্থ নেই সেখানে আওয়াজ পৌঁছাবেন আল্লাহ।

সুলাইমান (আঃ)-এর পিপীলিকার গাশ্‌ত এবং অস্থিরতা

হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর পিপিলিকার প্রতি লক্ষ্য করুন। হযরত সুলাইমান (আঃ) যখন সৈন্যসামন্ত নিয়ে রওনা হয়েছেন তখন পিপীলিকা সর্দার অস্থির হয়ে পড়েছে। সে লক্ষ্য করল, সৈন্য বাহিনী আসছে। এরাতো সব পদদলিত করে যাবে। তাই সে সকল পিপীলিকাকে চিৎকার করে বলল, ‘তোমরা নিজ নিজ গর্তে ঢুকে পড়।’ এই চিন্তায় সে গাশতে বেরিয়ে পড়ল। আর সবাইকে নিজ নিজ আশ্রয়ে চলে যেতে বলল। ইরশাদ হচ্ছে,

قَالَتْ نَمْلَةٌ يَّاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسَاكِنَكُمْ لَايَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُوْدُهٗ وَهُمْ لَايَشْعُرُوْنَ - (پاره/١٩)

'এক পিপীলিকা বললঃ হে পিপীলিকা দল, তোমরা তোমাদের নিবাসে ঢুকে পড় যাতে অজ্ঞাতে সুলাইমান ও তাঁর সৈন্য বাহিনী তোমাদেরকে পিষে না ফেলে।'

সম্মানিত বন্ধুগণ! একটি পিপীলিকার দ্বারা সম্ভব নয়, তার মত ক্ষুদ্র প্রাণীর কথা সুলাইমান (আঃ)-এর মত একজন বড় বাদশাহর কানে পৌঁছানো। তবে যতটুকু তার ক্ষমতায় আছে ততটুকু সে করেছে। অথচ পিপীলিকার এটা দায়িত্ব ছিল না। পক্ষান্তরে বিছানা-পত্র নিয়ে চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে দ্বীনের কথা বলা আমাদের দায়িত্ব। অদায়িত্বশীল পিপীলিকা যখন এতটুকু করেছে তখন তার আওয়াজ আল্লাহ তায়ালা সুলাইমান (আঃ)-এর কানে পৌঁছে দিয়েছেন। একথা শুনে তিনি হেসে ফেলেছেন।

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا

'তার কথায় হযরত সুলাইমান (আঃ) হেসে ফেললেন' যে একটি পিপীলিকা তার স্বজাতিকে বাঁচাবার জন্যে কি চেষ্টাই না করছে! আর তার এই আওয়াজ শুধু সুলাইমান (আঃ)-ই শুনেছেন এমন নয় বরং সমস্ত লশকর শুনেছে। অথচ পিপীলিকা আমাদের উরুর উপর বসে থাকলেও আমরা টের পাইনা। কথা শোনার তো প্রশ্নই ওঠেনা।

ক'হাজার বছর আগে একটি পিপীলিকা একটি আওয়াজ তুলেছিল আজ ক'হাজার বছর পরেও রমযানসহ বিভিন্ন মাসে-সময়ে সূরা 'নামাল' তিলাওয়াতের সময় কোটি কোটি মুসলমান তার সেই আওয়াজ শুনছে।

আল্লাহ সর্ব শক্তিমান

এটা আল্লাহর অসীম কুদরতের ফসল, তিনি ক'হাজার বছর পূর্বে প্রদত্ত একটি পিপীলিকার একটি মমতাভরা আওয়াজকে ক'হাজার বছর পরও লক্ষ কোটি মানুষকে শোনাচ্ছেন। আমাদেরও কাজ হলো নিজেদের সামান-পত্তর নিয়ে সমগ্র দুনিয়া ঘুরে আল্লাহর বড়ত্বের কথা ঘোষণা করব, তাহলে সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের আওয়াজ যেখানে পৌঁছা প্রয়োজন সেখানে পৌঁছে দিবেন। আওয়াজ দেয়া আমাদের কাজ, পৌঁছানো আল্লাহর কাজ।

বিলম্ব আছে অন্ধকার নেই

সর্বকালেই বেঈমানরা বলে এসেছে, 'তোমাদের এতবড় আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেন না কেন?' কিন্তু মনে রাখতে হবে, হযরত নূহ (আঃ)-এর প্রতি সাহায্য এসেছিল সাড়ে নয়শ' বছর পর। অন্যান্য নবীগণের প্রতিও সঙ্গে সঙ্গেই সাহায্য আসেনি।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদেরকে কঠিন সাধনায় ফেলে পরীক্ষার পর পরীক্ষায় পোড়ে তাদের মধ্যে পর্বত কঠিন শক্তি সৃষ্টি করেন। অতঃপর বিস্ময়করভাবে সাহায্য করেন।

সকল নবীকেই তার গলিত- বিকৃত জাতি শক্তির দম্ভ দেখিয়েছে। স্বীয় ধন-দৌলতের প্রতিও তাদের অহংকার ছিল। তাদের অহংকারী সভাসদ ছিল। তারা নবীদেরকে বলত, 'তুমি আমাদের এলাকা ছেড়ে চলে যাও, নইলে আমরা তোমাকে শেষ করে ফেলব। অথবা আমাদের মত হয়ে যাও। যদি আমাদের মত না হতে পার তাহলে আমাদের এলাকায় থাকার অনুমতি নেই। আমাদের শহর থেকে বেরিয়ে যাও।'

আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার

আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তা এসবের উত্তর দেন। তিনি এভাবে জবাব দেন, 'যদি তোমরা সংশোধনকারীদেরকে তাড়িয়ে দিতে চাও তাহলে আমি তোমাদেরকে এই পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দেব। আর যারা সংশোধিত -পরিশোধিত হবে তাদেরকেই শুধু এই পৃথিবীতে বসবাস করতে দেব।' কুরআন শরীফে আল্লাহ এ কথা বলেছেন। যে কোন নবী যখন দাওয়াতের কাজ নিয়ে নেমে এসেছেন তখন উদ্‌ভ্রান্ত পথহারা সম্প্রদায় তাঁকে কষ্ট দিয়েছে। গালমন্দ পেড়েছে। ইরশাদ হচ্ছে,

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا

'রাসূলগণকে সেকালের কাফের সম্প্রদায় বলত, হয়ত আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে -অন্যথায় তোমাদেরকে আমাদের এলাকা থেকে বের করে দেব।' তাদের শক্তি অহংকার ছিল। তাই তারা এসব কথা বলত।

কিন্তু আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্য, জান্নাত-জাহান্নাম, ও সাগর-পর্বতের সৃষ্টিকর্তা, আকাশ থেকে তৈরী আবার অবতীর্ণকারী প্রভু, সমুদ্রের মধ্যে বারটি পথ রচনাকারী আল্লাহ হযরত ইউসূফ (আঃ)- কে কারাগার থেকে

মুক্তি করে– তাঁরই কদমের সামনে মিশরের সম্পদভান্ডার সমবেতকারী মাওলা , নিঃসীম শক্তির আধার, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ বলেছেন,

فَاَوْحٰى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ

'আল্লাহ তায়ালা রাসূলগণের প্রতি এই মর্মে ওহী করেছেন যে, নিশ্চয় আমি অত্যাচারীদেরকে ধ্বংস করে ফেলব।' আল্লাহ তায়ালা আসমান থেকে ওহী পাঠালেন যে, 'যারা তোমাদেরকে শহর ও নগর থেকে বের করে দিতে চায় তাদেরকেই আমি বের করে দেব।' ইরশাদ হচ্ছে,

وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ هِمْ

'এবং তাদের পর তোমাদেরকেই শুধু পৃথিবীতে বসবাস করার সুযোগ দেব।'

মক্কার বেঈমানদের সাথেও আল্লাহ তায়ালা একই আচরণ করেছেন। তারা সকলে মিলে প্রোগ্রাম তৈরী করেছিল, 'রাসূল (সাঃ) কে আমরা হত্যা করব, ঘেরাও করে রাখব অথবা অন্য কোথাও নির্বাসিত করে দিব।'

নিজের খাদেম নিজেই

কিন্তু আল্লাহ তায়ালা বলে দিয়েছিলেন, বদরে তারাই নিহত হবে ইতিপূর্বে যারা হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে। বন্দী হবে তারাই যারা বন্দী করার ফন্দি এঁটেছে। বাড়ি-ঘরও ছেড়েছে তারাই। বেঈমানরা রাসূল (সাঃ)- এর বিরুদ্ধে তিনটি পরিকল্পনা করেছে, তিনটিই তাদের জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে। আর আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদেরকে বলেছেন,

وَاذْكُرُوْٓا اِذْاَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ وَاٰوٰىكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

'তোমরা সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন তোমরা সংখ্যায় ছিলে খুবই নগণ্য। তোমরা পৃথিবীতে এত অসহায় ছিলে, ভয় করতে লোকেরা তোমাদেরকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায় কি-না।'

আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে স্বীয় সাহায্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং পবিত্র রিযিক দান করেছেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।"

অর্থাৎ মক্কায় অবস্থানকালে মুসলমানরা কত অসহায় দুর্বল ও হতবল ছিল। আল্লাহ তাদেরকে মদীনায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অদৃশ্যভাবে সাহায্য করেছেন। নেয়ামতের ঝর্ণা প্রবাহিত করেছেন।

মুহ্তারাম বন্ধুগণ!
রাসূল (সাঃ) পূর্ববর্তীদের ঘটনা বলেছেন আর অমনিই তাঁর যুগের কাফেররা বলে বসেছে, আরে এগুলোতো গল্পকথা! কিন্তু আল্লাহ তায়ালা রাসূল (সাঃ)- এর যুগেও সেই পুরনো কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। আর তখনই কাফের গোষ্ঠীর টনক নড়েছে।
আমি বলি, এখনো আমাদের আল্লাহ একই শক্তিতে বলীয়ান। তিনি আগের মতই অপার ক্ষমতার মালিক। আর তিনি শুধু আমাদেরই নন; তিনি সমগ্র মানবতার প্রভু।

সবই সত্য

আল্লাহর শক্তির বিরুদ্ধে উট আর রকেটের কোন পার্থক্য নেই। তাঁর শক্তির সামনে লাঠি, তলোয়ার আর এটম বোমা সবই সমান। তাঁর শক্তির সামনে সবই নস্যি।

সমগ্র পৃথিবীকে আহ্বান

আমরা সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে আহ্বান জানাই, তোমরা আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তার শক্তির সামনে আত্মসমর্পণ কর, তাহলে তোমাদের সকল সমস্যা কেটে যাবে আর যদি তাঁর কুদরতের সামনে নতি স্বীকার না কর তাহলে যতদিন তিনি সুযোগ দিবেন ততদিন টের পাবে না। যখন পাকড়াও করবেন তখন আর বাঁচার পথও পাবে না।

এসবই নবীগণের কাহিনী। তাদের স্বজাতির কাহিনী। তাদের দম্ভোক্তির বিরুদ্ধে আল্লাহর আযাব ও ওহীর ধমকের কাহিনী! বেঈমানরা চেয়েছে ঈমানদারগণকে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে সরিয়ে ফেলতে কিন্তু আল্লাহ কাফের গোষ্ঠীকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে সেখানে কেবল ঈমানদারদেরকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এটা রাসূল (সাঃ)-এর যুগে ঘটেছে। আজকের বিশ্ব সম্পর্কেও একই কথা বলেছেন।

পরকালের ভয়ই প্রসন্নতার উপায়

আমাদের আল্লাহ বলেন, আমি ঈমানদারগণকে পৃথিবীতে বসবাস করতে দিয়েছি, তাদের মাধ্যমে পৃথিবীকে আবাদ করেছি আর উদ্ভ্রান্তদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি—এটাই আমার নিয়ম-পদ্ধতি। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত যদি কাউকে পৃথিবীতে টিকে থাকতে হয়, বসবাস করতে হয়, তাহলে আল্লাহর

সামনে মাথা নত করতে হবে। কিয়ামতের দিন তাঁর সামনে দাঁড়াবার ভয়, আল্লাহর হুশিয়ারীর ভয় সৃষ্টি হতে হবে সকলের হৃদয়ে-অন্তরে। যদি আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয়ে যায়, কিয়ামত দিবসে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবার ভীতি সঞ্চার হয়, আল্লাহর নিয়ম হলো, আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করবেন না, তাদের এলাকাকে ধ্বংস করবেন না। এরশাদ হচ্ছে,

ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِى وَخَافَ وَعِيدِ- (پاره/١٣)

'এটা তাদের জন্যে, যারা আমার মর্যাদাকে ভয় করে, ভয় করে হুশিয়ারীকে।' সুতরাং সারা পৃথিবী জুড়ে আখিরাতের খুব চর্চা হওয়া উচিত। নিজের স্ত্রী-পুত্র, দোকানের ক্রেতাদের সামনে অর্থাৎ যখন যেখানে থাকবে সেখানেই পরকালের চর্চা হবে। মানুষের সমাজে যদি রীতিমত আল্লাহর কথা আলোচনা হয়, পরকাল চর্চা হয়, যদি প্রতিটি মানুষের মধ্যে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবার চেতনা সৃষ্টি হয় তাহলে আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করবেন না; তাদের আবাসভূমিকেও ধ্বংস করবেন না।

আমরা সারা পৃথিবীকে আবাদ করতে চাই। আমরা ধ্বংস চাইনা। আমরা সারা পৃথিবীর সকল মানুষের সকল সমস্যার উত্তরণ চাই। সকল সমস্যা থেকে মুক্তি চাই। পথও একটিই, আমরা যদি আল্লাহর শক্তির সামনে আনত হই তাহলে সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

হযরত নূহ (আঃ) ভীতি প্রদর্শন করলেন স্বীয় সম্প্রদায়কে

اِنَّآ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ- (پاره/٢٩)

"নিশ্চয় আমি নূহ (আঃ)-কে তার সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি (এই মর্মে) যে, তুমি তোমার সম্প্রদায়কে বেদনাদায়ক শক্তি পেয়ে বসার পূর্বেই ভীতি প্রদর্শন কর।"

হযরত নূহ (আঃ)কে বললেন, তুমি তোমার সম্প্রদায়কে ভীতি প্রদর্শন কর! যেন পিস্তল হাতে তিনি কাউকে ভয় দেখাবেন। হযরত নূহ (আঃ) ও তাঁর সম্প্রদায়কে ভয় দেখাতে লাগলেন। বলতে লাগলেন, দেখ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। ভাল হয়ে যাও! এই দেখ পিস্তল। কিন্তু গুলি ছোড়া যাবে না। অর্থাৎ, আল্লাহর আযাবকে ডাকা যাবে না, আহ্বান করা যাবে না। তবে যে আযাবের ভয় দেখাতে হবে। সারা পৃথিবীকে ভয় দেখাতে হবে। সাথে আল্লাহ তায়ালা একথাও বলে দিয়েছেন–

مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّأْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ-

"ভয় দেখাতে হবে বেদনাদায়ক শাস্তি গ্রাস করার পূর্বেই।" কিন্তু আল্লাহর আযাব এসে যাবার পর তখন আর তা হটাবার উপায় থাকবে না।

সুতরাং অসন্তুষ্ট হয়ে সারা জগতকে আযাবে নিক্ষিপ্ত করার পূর্বেই দুনিয়ার সর্বত্র ঘুরে ঘুরে আল্লাহর আযাব সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করতে হবে। আমাদেরকে আমাদের আমলও ঠিক করতে হবে, ঈমানকে শক্তিশালী করতে হবে, নেককর্মগুলোকে করতে হবে বলিষ্ট। এভাবেই আমাদের পথ হবে সুগম।

যাকাত না দেয়ার পরিণতি

যাদের উপর যাকাত ফরয হয়েছে তাদেরকে যাকাত দেয়া উচিত। অবশ্য কর্তব্য। কারণ, সে যদি যাকাত না দেয় তাহলে তার এই সম্পদকে জ্বলন্ত পাতে রূপায়িত করে কেয়ামতের দিন তা দিয়ে তাকে ছেকা দেয়া হবে। এবং তার সম্পদ অজগর বানিয়ে তার গ্রীবায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে। সাপ তাকে দংশন করতে থাকবে।

যাকাতের যে অংশটুকু মূল সম্পদের সাথে থেকে যায় সেটা অন্য সব সম্পদের জন্যেও বিপদ। তাই সম্পদের সাথে সেটাকে সম্পৃক্ত না রেখে আলাদা করে ফেলাই উত্তম। অন্যথায় সেটা সকল সম্পদের জন্যে ভয়ানক বিপদ ডেকে আনবে। একসাথে দেয়ার সুযোগ না থাকলে, কিংবা যাকাতের উপযুক্ত প্রাপক যথাসময়ে না পাওয়া গেলেও যাকাতের অংশ আলাদা করে রাখা উচিত। অন্য সম্পদের সাথে রুলিং-এ না নেয়াই ভাল।

আমলের প্রভাব

পার্থিব বস্তুসমূহের যেমন প্রভাব আছে তেমনি আমলেরও প্রভাব থাকে। ফল থাকে। কেউ যদি নেক আমল করে তাহলে বেহেশ্তে তার জন্যে বেরকমারী নেয়ামত তৈরি হতে থাকে। আর যদি মন্দ আমল করে তাহলে জাহান্নামে তার জন্যে প্রস্তুত হতে থাকে দুর্বিষহ আযাব, জ্বলন্ত কয়লা ও হাত কড়া। যেভাবে 'সোবহানাল্লাহ' 'আল-হামদুলিল্লাহ' পাঠ করলে বেহেশতে বৃক্ষ তৈরি হয় আর যাকাত না দিলে তৈরি হয় সাপ। সকল ভাল-মন্দ আমলের ফল তৈরি হয় বেহেশতে।

যে কোন বস্তু ভাল-মন্দ ব্যবহারের ফলাফল

আমি একটি বস্তুগত উপমা দিচ্ছি। একটি দিয়াশলাই; এক ব্যক্তি একটি

কাঠি নিয়ে একটি লাকড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিল। লাকড়ীটি জ্বলে আরেকটি লাকড়ীতে ধরল। এভাবে প্রজ্জ্বলিত আগুনে দেখা যাবে পাঁচ হাজার ডেগ বিরানী পাকানো হয়ে গেছে। পোলাও তৈরি হয়েছে, কোর্মা তৈরি হয়েছে। এটা একটি কাঠির সহীহ ব্যবহারের ফসল।

আর এই কাঠিটি দিয়াশলাইতে ঘষে যদি এক ট্যাংকি পেট্রোলে লাগিয়ে দেয়া হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নেচে ওঠবে। তারপর কম আগুনে একটি লাকড়ীতে লাগিয়ে যদি রেশনের দোকানে লাগিয়ে দেয়া হয় তাহলে বিশ হাজার দোকান জ্বালিয়ে দিতে পারে। তুলার দোকানে লাগালে তাও জ্বলে-পুড়ে ভষ্ম হয়ে যাবে। এটা হলো একটি কাঠির ভুল ব্যবহারের ফসল।

সুতরাং প্রমাণিত হলো, দিয়াশলাইয়ের একটি কাঠির ঠিক ব্যবহার পোলাও-কোর্মা-বিরানী তৈরি করে আর ভুল ব্যবহার শুধু বিধ্বংসী কিছু অগ্নিফুলকা উপহার দেয়।

অনুরূপভাবে সাড়ে পাঁচ ফুট মানুষের শরীরটি যদি যথাযথ ব্যবহার হয়, যদি ব্যবহার হয় নামাযের মধ্যে, তালীমের হালকায়, আল্লাহর যিকির, কুরআন তেলাওয়াত, অন্যের সাথে ভালো আচরণের মধ্যে তাহলেই তা ঠিকই যথার্থ ব্যবহার হয়েছে বলা যাবে।

অমুসলিমের সাথে আচরণ

মুসলমান-অমুসলমান সকলের সাথেই ভাল ব্যবহার করা উচিত। আপনি আপনার ঘরে বসে আছেন। কোন বৃদ্ধার চিৎকার কিংবা কাতড়ানোর শব্দ শুনতে পেলেন। আপনি আপনার স্ত্রীকে পাঁচশ' টাকা দিয়ে পাঠালেন। সে গিয়ে দেখল বৃদ্ধা একজন অমুসলিম এবং সে তাকে টাকাটা দিয়ে দিল।

এটা রাসূল (সাঃ)- এর শিক্ষা। অমুসলিম কেউ বিপদগ্রস্ত হলে তার কষ্ট লাঘব করতেও চেষ্টা করতে হবে। এখানে মুসলমান-অমুসলমানের ভেদাভেদ নেই।

জুলুম কখনো ফল দেয় না

যদি কোন মুসলমান এক অমুসলমানের সম্পদ দখল করে নেয় তাহলে আমাদের উচিত হবে অমুসলমানকে সমর্থন করা। আর মুসলমানকে বুঝানো, ভাই তুমি তার জমিন তাকে দিয়ে দাও! যদি না দাও তাহলে সাত জমিন থেকে এই এক টুকরা জমিন আলাদা হয়ে তোমার গলায় ঝুলে পড়বে। তাই ওটা ফেরত দিয়ে দাও!

এটাকে মুসলমান-অমুসলমানের বিষয় বানানো ঠিক হবে না। কারণ, এখানে অমুসলমান নির্যাতিত, মুসলমান জালেম। আর জালেম মুসলমানকে জুলুম থেকে ফিরিয়ে আনাটাই তার প্রতি দয়া ও কল্যাণকামিতার শামিল।

কারণ–

ناؤ کاغذکی کبھی چلتی نہیں
ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں

কাগজের নৌকা কভু চলিতে না পারে
জুলুমের বৃক্ষে কভু ফল নাহি ফলে।

দ্বীনদার পিতা ও দ্বীনদার পুত্র

কোন মুসলমান যদি অত্যাচার করে তাহলে তার কাঁধে হাত রেখে বলা উচিত–আরে, তোমার বাপ মুসলমান! সে এক অমুসলমানের সম্পদ দখল করে নিয়েছে। তাকে গিয়ে বল, আব্বাজান! এই জমি ফেরত দাও! কিন্তু বাপ যেহেতু ভাল পরিবেশে বেড়ে ওঠেনি। তাই পার্থিবতার প্রতি তার প্রচন্ড ভালবাসা। তাই বাপ বলবে, বেটা, এটা করা যাবে না!

এখন ছেলে দেখল, তার পিতা কিয়ামতের দিন কঠিন বিপদে পড়ে যাবে। কারণ, বাপ অমুসলিমের হক দখল করে আছে। তাই সে বাপকে বুঝিয়ে বলল বাপের প্রতি দয়া-পরবশে, আব্বাজান, এই অমুসলিমের কাছ থেকে আপনি যতটুকু সম্পদ নিয়েছেন, ততটুকু আমার অংশ থেকে আপনাকে দিতে প্রস্তুত আছি। আপনি আমার কাছ থেকে জমি নিয়ে নিন। আর অমুসলিমকে তার জমি ফেরত দিয়ে দিন।

এখানে পিতাকে নিজের জমি দিয়ে দেয়া চারিত্রিক ব্যাপার। আর অমুসলিমকে তার জমি ফিরিয়ে দেয়া নীতি ও ইনসাফের ব্যাপার। কিন্তু দেখা গেল বাপ এতবড় দুনিয়াদার যে, সে বলে ফেললঃ বেটা! আমি তোমার অংশও নেব আর তার অংশও ছাড়ছিনা। কিছু কিছু লোক এ জাতীয় হয়। তাদের বয়স যত বাড়ে সম্পদের ভালবাসাও ততই বাড়ে। তবে আল্লাহ্ যাকে চান তাকে এসব থেকে পবিত্র রাখেন।

সত্যকে সত্য বলা

মুহ্তারাম বন্ধুগণ!

বাপ মানতে নারাজ! এবার বিষয়টি আদালতে ওঠেছে। বিচারকের সামনে

মকদ্দমা ওঠেছে। এখন ছেলের কর্তব্য হবে বিচারকের সামনেও একথা বলা – বিচারক সাহেব ! ইনি আমার পিতা ! তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন আমার কর্তব্য। তাঁর প্রতি শিক্ষিতপূর্ণ আচরণ আমার জন্যে অনিবার্য। কিন্তু একটি কথা হল, আমার বাপ যেমন আল্লাহর বান্দা তেমনি এই অমুসলিমও আল্লাহর বান্দা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এই জমি অমুসলিমের। আমার বাপের নয়।

এটাই আমাদেরকে রাসূল (সাঃ) শিখিয়েছেন। এখানে মুসলমান অমুসলমানের প্রশ্ন নেই।

দোকান থেকেও দাওয়াতের ধ্বনি

আপনি সকালবেলা দোকান খুললেন। দোকানে আপনি চাল বিক্রি করেন। বিক্রি করেন আরও অনেক কিছু। পঞ্চাশ টাকায় আপনি দশ কেজি চাল বিক্রি করেন কিংবা কম-বেশী। দোকান খোলার পর লোকজন আসল। সবাইকেই আপনি দশ-দশ কেজি করে চাল মেপে দিলেন।
আপনার মহল্লার এক অমুসলিম বৃদ্ধাও ভোরবেলা লাঠি ভর করে আপনার দোকানে এসে হাজির। এসে বলল, আমাকে পঞ্চাশ টাকার চাল দিন। আপনি তাকে দশ কেজির পরিবর্তে বিশ কেজি দিয়ে দিলেন। কারণ, তার দুঃখ-কষ্টের কথা আপনি জানেন।

এখন অন্যসব খদ্দেররা যারা কেউ লালাজী, কেউ সরদারজী এবং তাদের মধ্যে সেই মুতাওয়াল্লীজীও আছেন যিনি সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে রেখেছেন যে, "আমাদের মসজিদে বয়ান করা নিষেধ।" এখন এই নেতাজীরা সকলেই ছিঁ ছিঁ করতে শুরু করেছেন, ওকে পঞ্চাশ টাকায় বিশ কেজি আর আমাদেরকে দশ কেজি কেন ? তখন আপনি বললেন, দেখুন, আসলে দরতো পঞ্চাশ টাকায় দশ কেজিই। এই বৃদ্ধাকে আমি অতিরিক্ত দশ কেজি দিয়েছি অনুগ্রহ স্বরূপ। বৃদ্ধা আমার মহল্লার। রাতের বেলা আমি তার কান্নাকাটি শুনি।

তারপর আপনি বৃদ্ধাকে বললেন, আচ্ছা, রাতের বেলা এভাবে কাতরান কেন? তখন অমুসলিম এই বৃদ্ধা বলল ঃ আমার সাতটি ছেলে আছে। তাদের সকলকেই আমি বিয়ে দিয়েছি। তারা সকলেই তাদের বউ নিয়ে চলে গেছে। তারা কেউ আমার কোন খোঁজ-খবর নেয় না। একথা বলে সে কাঁদতে লাগল। তার কান্না দেখে তখন আপনারও কান্না পেল। কারণ–

درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو

ورنہ طاعت کیلئے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں

সমর্মিতার জন্যেই মানুষের সৃষ্টি,

আনুগত্যের জন্যে ফেরেশতারাই যথেষ্ট ছিল।

অর্থাৎ ইবাদত ও আনুগত্যই যদি শুধু উদ্দেশ্য হতো তাহলে তো ফেরেশতারাই যথেষ্ট ছিল। মানুষ সৃষ্টির কি প্রয়োজন ছিল? এর অর্থ এ নয় যে, মানুষকে ইবাদতের জন্যে সৃষ্টি করা হয়নি। ইরশাদ হচ্ছে–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ (پاره/۲۷)

'জিন ও মানুষকে শুধু ইবাদতের জন্যেই সৃষ্টি করেছি।' জিন ও মানুষকে শুধু ইবাদতের জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে মানুষের ইবাদতের সাথে সাথে অন্যের প্রতি সহমর্মিতা ও সমবেদনাও থাকতে হবে। যে কারণে বুড়ি কাঁদছে, সেই সাথে আপনিও কাঁদছেন।

উপস্থিত নেতাজীরা এসব কান্ড দেখছে আর বিস্মিত হচ্ছে। তাজ্জব বোধ করছে। পরস্পরে কোন আত্মীয়তার বন্ধন নেই অথচ কত গভীর সমবেদনা; কত আন্তরিক মমতা।

তারপর আপনি আপনার ছেলেকে বললেন ঃ বাবা, তুমি তোমার মাপ-ঝোক কর্মচারীর হাতে দিয়ে মোটরে করে এই বুড়ি মহিলাকে হাসপাতালে ভর্তি করে আস। আর এই নাও তিন হাজার টাকা। ডাক্তারকে এটা অগ্রিম দিয়ে আসবে। আর ডাক্তারকে আমি ফোন করে দিচ্ছি এই বৃদ্ধার চিকিৎসায় যত টাকা লাগবে আমার দোকান থেকে পরিশোধ করা হবে। খরচ যা লাগে আমি দেব।

ছেলে মোটরে করে মহিলাকে নিয়ে গেল। আপনি দোকানে বসে টেলিফোনও করে দিলেন।

ঘটনাদৃষ্টে লালাজী, সরদারজী ও মুতাওয়াল্লীজী সকলেই খুশী। তারা সকলেই আন্তরিক হয়ে উঠল। আন্তরিকতা যখন গড়ে ওঠেছে এখন বন্ধনগড়ার চেষ্টা করুন।

ঘটনার এ পর্যায়ে আপনি বললেন ঃ লালাজী, সরদারজী এবং মুতাওয়াল্লীজী! আমার মন চায় আপনারা একবার আমার বাড়িতে আসুন।

একসাথে বসে এক বেলা খানা খাই, চা পান করি। আপনার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখে তারা আনন্দচিত্তেই আপনার ঘরে চলে আসবে। এখন আপনি তাদেরকে খানা খাওয়ানোর সাথে সাথে কিছু ঈমানী কথাও পান করিয়ে দিন। এতে করে তারা খুব প্রভাবিত হবে।

খরচ কম, মর্যাদা বেশী

তারপর আপনার ছেলের বিয়ে ঠিক হল। আপনি ছেলের বিয়েতে তাদেরকেও দাওয়াত করলেন। তারা আনন্দ মনে সকলেই এলেন।

আপনিতো লাখপতি – কোটিপতি। কিন্তু ছেলের বিয়েতে খরচ করেছেন মাত্র কয়েক হাজার টাকা। এখন তারা বলছে, আপনি একজন এতবড় ধনী, অথচ ছেলের বিয়েতে মাত্র কয়েক হাজার টাকা খরচ করলেন।

তখন আপনি বললেন : দেখুন, আমার ছেলে রাসূল (সাঃ)-এর মেয়ের চাইতে বেশী দামী নয়। রাসূলের কন্যাদের বিয়ে যখন সাদাসিধেভাবে হয়েছে তখন আমার ছেলের বিয়ে সাদামাটা হতে অসুবিধা কোথায় ? বরং এখনইতো হওয়া উচিত।

আর বিয়েতে যে পয়সা আমি বাঁচিয়েছি এগুলো আমি কোন ব্যাংকে জমা করিনি। বরং এই পয়সা দিয়ে আমি অনেক অবিবাহিত ছেলে-মেয়ের বিয়ে করিয়ে দিয়েছি।

আমি কলোনী বানিয়েছি

আর আমি একটি কলোনীও বানিয়েছি। এই কলোনীর একটি কক্ষ আমার, একটি আমার স্ত্রীর আর একটি আমার পুত্র ও পুত্রবধূর, অন্যসব কক্ষগুলোর জন্যে আমি গরীবদের কাছে গিয়েছি। তাদের সাথে কথা বলেছি। বলেছি : দেখ, তোমরা মাসে পচাত্তর টাকা করে ভাড়া দাও। এভাবে পঁচিশ বছর যাবত ভাড়াটিয়া হয়ে আছ। আমার কলোনীর প্রতিটি কক্ষে খরচ হয়েছে বার হাজার টাকা। তোমরা যদি মাসে একশ' টাকা করে দাও তাহলে বছরে বারশ' টাকা হবে। এভাবে দশ বছরে সম্পূর্ণ মূল্য আদায় হয়ে যাবে।

এভাবে বহুলোক আমার কলোনীতে থাকতে শুরু করেছে। তাদের কেউ কেউ প্রতিমাসে একশ'র পরিবর্তে দুইশ' কেউ কেউ পাঁচশ' করে দিচ্ছে। এবং পাঁচ বছরেই মালিক বনে গেছে।

তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছে যারা পয়সা দিতে পারেনি। কিন্তু আমরা তাদের সম্মানের উপর আঘাত করিনি। বরং ভিন্নপথে আমরা তাদের হাতে যাকাতের অর্থ পৌঁছে দিয়েছি। হাদিয়ার পয়সা পৌঁছে দিয়েছি। আমরা কোনভাবেই তাদেরকে অপমানিত করিনি।

আমরা ইচ্ছে করলে এসব গরীবদেরকে বিনেপয়সায়ও কক্ষ দিতে পারতাম। কিন্তু এতে তারা ভিক্ষে করে যাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ত। আমরা এই গরীবদেরকে পায়ের জুতো বানাতে চাই না। আমরা চাই তাদেরকে মাথার টুপি বানাতে। আমরা চাই তারা সম্মানের সাথে বসবাস করুক। আপনারা চাইলে আমি সেই কলোনীও পরিদর্শন করাতে পারি।

কলোনীতে ঈমানের মজলিস, ঈমানের কথা

এখন লালাজী, সরদারজী ও মুতাওয়াল্লীজী কলোনী দেখতে গেলেন। কলোনীর সর্বত্রই গরীবদের নিবাস। এক কক্ষ আপনার, আরেকটি আপনার পুত্রের। মাঝে মসজিদ। এখানে এক জামাত আসছে, আরেক জামাত যাচ্ছে। কোথাও তা'লীমের হালকা কোথাও যিকিরের মজলিস। ঈমানের আমোদিত আয়োজন। বেশ চাঞ্চল্য। কোন দারোয়ান নেই, প্রহরী নেই।

মুহ্তারাম বন্ধুগণ!

এই দৃশ্য দেখে সকলেই পরিতৃপ্ত। তারা বলল ঃ পৃথিবীতে এ এক অদ্ভূত দৃশ্য। সর্বত্রই সকলেই কেবল নিতে চায়। তাই সর্বত্র যুদ্ধ। আর তোমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম শিখিয়েছেন দেয়ার আদর্শ। তিনি ছিনিয়ে নেয়া শিখাননি। শিখিয়েছেন বিলিয়ে দেয়া। যত বিলাবে ততই সম্পর্ক সৃষ্টি হবে। যতটুকু ছিনিয়ে নিবে ততটুকুই বিছিন্নতার সৃষ্টি হবে।

বিচ্ছিন্নতার পথ

সারা পৃথিবীতে চলছে ছিনিয়ে নেয়ার প্রতিযোগিতা। মিথ্যা, সুদ, ধোকা, প্রতারণা, খেয়ানত, মাপে কম দেয়া, চুরী-ডাকাতি এসবই ছিনিয়ে নেয়ার পথ। সারা পৃথিবীর জীবন পদ্ধতিই এখন গ্রহণ ও অর্জনের উপর নির্ভরশীল। যদি কেউ কিছু দেয় তাও পাওয়ার জন্যে দেয়। এবং এটাও সত্য, যারা এই অন্যের কাছ থেকে নেয়ার মন নিয়ে গড়ে ওঠবে তারা কাঙাল হবে। আর যারা দেয়ার মানসিকতা নিয়ে গড়ে ওঠবে আল্লাহ তাদেরকে ঐশ্বর্যে ভরে দিবেন।

আপনারা হয়তো বলবেন: কেবল দাও, দাও, দাও........। সদকার সময়, যাকাতের সময় দাও, হাদিয়া দাও, আত্মীয়-স্বজনকে দাও। গরীব-অসহায়কে দাও, অমুসলিমকে দাও! আপনাদের মনে আসতে পারে, মৌলভী সাহেব! আপনি তো কেবল দেওয়ার কথাই বলছেন! নেয়ার জায়গাও দেখান! পাওয়ার উপায়ও বলুন।

আল্লাহর ভান্ডার-ই নেয়ার জায়গা

পাওয়ার জায়গার কথাও আমি বলে দিচ্ছি! নেয়া ও পাওয়ার জায়গা হলো আল্লাহ'র খাযানা, আল্লাহর অসীম ভান্ডার। আল্লাহর প্রতি এক হাত বাড়িয়ে দাও নেয়ার জন্যে, আরেক হাত তাঁর বান্দাদের প্রতি বাড়িয়ে দাও দেয়ার জন্যে। আল্লাহ থেকে গ্রহণকারী হও, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদেরকে দানকারী হও, আল্লাহর সৃষ্টির দৃষ্টিতে প্রিয়পাত্র হও।

এভাবে আল্লাহরও প্রিয় হওয়া যায়, মাখলুকের কাছে প্রিয় হওয়া যায়। তোমার চেহারা দেখে তখন মানুষ খুশী হবে, কত ভাল মানুষ!

মুহতারাম বন্ধুগণ! যদি দান করার মনোভাব সৃষ্টি হয়, মানুষের প্রতি কল্যাণকামিতার চেতনা সৃষ্টি হয়, তাহলে নিজের চোখেই বেশুমার বরকত দেখতে পাবেন। আর ছিনিয়ে আনার মানসিকতা সৃষ্টি হলে যুদ্ধ ছাড়া কিছুই মিলবে না।

বেদনাশীল মানুষ

আমি একটি উপমা দিচ্ছি! মিষ্টান্ন! পাঁচজন মানুষ খেতে বসেছে। সকলেই বসেছে মিষ্টান্ন খাবে। সকলেই পরস্পরে সমবেদনাশীল, আন্তরিক, সামান্য মিষ্টান্ন। এখন সকলেই চাচ্ছে, আমি নাইবা খেলাম। অন্যেরা খেয়ে নিক। তাই কেউ খাচ্ছে না। তারপর একজন সাহস করে লোকমা তুলেছে। তুলে দিয়েছে অন্য একজনের মুখে। একে একে চারজনের মুখের মধ্যেই লোকমা তুলে দিয়েছে। আবার তুলে দিয়েছে এক এক লোকমা করে দ্বিতীয় বার। অপর চারজনও আন্তরিক ও সমব্যথী ছিল। সে বলল ঃ ভাই, তুমি শুধু আমাদেরকেই খাওয়াচ্ছ। তুমি খাচ্ছ না। এই বলে তারা সকলেই তার মুখে এক এক লোকমা করে তুলে দিল। এভাবে মিষ্টান্নও শেষ হয়ে গেল এবং তাদের পরস্পরে ভালবাসা সম্প্রীতিও সৃষ্টি হল।

এখন এই চারজন বলছে, ভাই, তুমি কত ভাল মানুষ। তুমি আমাদের সকলকেই খাইয়েছ দুই লোকমা করে আর আমরা তোমাকে খাওয়ালাম

এক লোকমা করে। আর সে বলছে, ভাই তোমরা আমার চাইতে অনেক উত্তম। কারণ, আমি তোমাদেরকে খাইয়েছি দুই লোকমা করে। আর তোমরা আমাকে এক লোকমা এক লোকমা করে মোট চার লোকমা খাইয়েছ। দেখুন! বন্টনকারীই লাভবান হয়েছে। লাভবান হয়েছে বিতরণকারী। আর এটা তখনই হবে যখন আন্তরিকতা ভালোবাসা ও উৎসর্গের মানসিকতার সৃষ্টি হবে। আমরা এসব গুণের কথাই বলছি।

লোভী মানুষ

পক্ষান্তরে সেই একই মিষ্টান্ন খেতে বসেছে অপর পাঁচ জন। তারা সকলেই লোভী। তাদের সকলেই ভাবল, সবটা মিষ্টান্ন আমি খেয়ে ফেলব। কিন্তু খেতে পারছে না। কারণ দ্বিতীয় জন তো সেই একই কথা ভাবছে। একই ভাবনা নিয়ে বসে আছে অন্য তিন জনও।

তারপর যখন শুধু হলো আহারপর্ব, একমুহূর্তে শেষ। এক বিন্দুও নেই। এবার তাদের কথকতা শুনুন! তাদের একজন বলছে, আরে লোভী কোথাকার, আমি এক লোকমা খেতে খেতে তুমি তিন লোকমা খেয়েছ–তিন লোকমা। আর তিন লোকমা গ্রাসকারী বলছে, তোমার এক লোকমাতো আমার ছয় লোকমার সমান। এজন্যেই ওটা সামাল দিতে তোমার এত সময় লেগেছে।

কমবেশী তো উভয়ই পেয়েছে। কিন্তু যে অন্যদেরকে বিতরণ করেছিল সে পেয়েছিল চার লোকমা, আর বাকীরা পেয়েছিল দুই লোকমা করে। আর যারা হৈ হুল্লোর করে খেয়েছে তারাও কমবেশী পেয়েছে। তবে এখানকার কমবেশী শত্রুতা ও লড়াইর সাথে পেয়েছে। প্রথম দল পেয়েছে আন্তরিকতা ও ভালোবাসার সাথে।

সম্মানিত বন্ধুরা আমার!

এক হাত আল্লাহর দিকে সম্প্রসারিত কর ইবাদতের মাধ্যমে। দ্বিতীয় হাত সম্প্রসারিত কর বান্দার দিকে চরিত্রের মাধ্যমে। এক হাতে নিবে, অন্য হাতে দিবে। আল্লাহর নিকট থেকে গ্রহণ করার মাধ্যমে আল্লাহর প্রিয় হও আর বান্দাদেরকে দানের মাধ্যমে বান্দার দৃষ্টিতেও প্রিয় হও। কথা বলতে থাকলে অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে।

আমরা পবিত্র জীবনের আলোচনা শুনছি। নবী-রাসূলগণের জীবনের আলোচনা শুনছি। এটাও মনে রাখতে হবে নবীদের যুগে আল্লাহ পাক যা

করেছেন কিয়ামত পর্যন্ত তাই করতে থাকবে। এটা আল্লাহ তায়ালার অঙ্গীকার।

إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ (پاره/٢٩)

'সৎ কর্মশীলদেরকে আমি এভাবেই প্রতিদান দিয়ে থাকি।'

সৎ কর্মশীলদেরকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দিয়েছেন। নবীগণকে অদৃশ্য থেকে সাহায্য করেছেন। কিন্তু এতসবের পরেও যদি উদ্‌ভ্রান্ত লোকরা সংশোধন না হয় তাহলে আল্লাহ তায়ালার আচরণ কেমন হবে?

আদ সম্প্রদায়ের সাথে যা হয়েছিল–

كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ (پاره/٢٩)

'এভাবেই অপরাধীদেরকে পাকড়াও করে থাকি।'

দাওয়াতের পরিবেশ যেভাবে সৃষ্টি হয়

এ জন্যে প্রয়োজন দাওয়াতের পরিবেশ সৃষ্টি। দাওয়াতের পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে প্রয়োজন ঈমানিয়্যাতের বীজ বপনপূর্বক তা'লীমী হালকার পানি সিঞ্চন। কুরবানীর সার চারদিকে অন্যায় পরিহারের প্রাচীর যখন সৃষ্টি হবে তখনই যিকির, তিলাওয়াত, কান্না-কাটির পরিবেশ তৈরি হবে।

যেখানে বৃক্ষ জন্মায় না মোটেই সেখানে যেভাবে পূর্ব প্রস্তুতি স্বরূপ জমি চাষবাস করে সমতল করা হয়, বীজ বপন করা হয়, আরও কত কি করা হয়।

উষ্ণ অশ্রু আর নীরব কান্না

সুতরাং দ্বীনের বৃক্ষ রোপণ করতে হলে, দাওয়াতের জমি সমতল করতে হবে, ঈমানের বীজ বপন করতে হবে, দীনী শিক্ষার পানি সিঞ্চন করতে হবে, কুরবানীর সার আর পাপ থেকে বাঁচার প্রাচীর তৈরি করতে হবে। তখনই যিক্‌র, তিলাওয়াত, কান্না-কাটি, আহাজারী, উষ্ণ-তপ্ত অশ্রু বর্ষণ, নীরব-শান্ত প্রার্থনা, দরদ ও ব্যথাদীর্ণ মুনাজাতের পরিবেশ সৃষ্টি হবে। ইসলামের মূলনীতির বীজ রোপিত হবে, ইসলামের আলোকময় লেন-দেন, চাল-চিত্রও ন্যায়-নীতির উপর প্রতিষ্ঠার বৃক্ষ বেড়ে ওঠবে। সে বৃক্ষ ঝুঁকে পড়বে চারিত্রিক ফল-ফুলে। সেই ফলের ভেতর যদি এখলাসের রস থাকে তাহলে মনে করতে হবে বৃক্ষ পূর্ণাঙ্গ হয়েছে। তখনই দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন ছুটে আসবে।

হ্যাঁ, যারা উদ্‌ভ্রান্ত পথভ্রষ্ট তারা নীচ থেকে পাথর মারবে। নীচ থেকে যখন পাথর মারা হয় উপর থেকে বৃক্ষ তখন ফল মারে। পাথরের জবাবে ফল। এইতো আদর্শ।

তবে আমার ভয় হয়। এদের স্বভাব এত গলিত এত অন্ধ তারা কি আবার মনে করে বসে কিনা যে, পাথরের বিনিময়ে যখন ফল আসছে তখন চল পাথরই মারতে থাকি।

বাতাসের বিপরীতে থুথু মারলে নিজের মুখেই এসে পড়বে

সারা পৃথিবীর পথহারা উদ্‌ভ্রান্ত লোকেরা শুনে নাও! আমাদের কাজ এটাই, তোমরা যতই আমাদেরকে পাথর মার আমরা তোমাদের প্রতি ফলই বর্ষণ করব। কিন্তু আসমান-যমীনের মালিক মহান আল্লাহ বলছেন: হে পাথর নিক্ষেপকারীরা, এ পাথর তোমাদের উপরই আপতিত হবে।

إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنْفُسِكُمْ (پاره/١١)

'তোমাদের অনিষ্টতা তোমাদের উপরই আবর্তিত হবে।' তোমাদের উপর যা কিছু আবর্তিত হয় সবই তোমাদের কর্মেরই ফসল। তাই আমরা গোমরাহ উদ্‌ভ্রান্ত লোকদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকি। আল্লাহর হুকুম সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করি। তাই পথপ্রাপ্ত সৎ লোকদেরকে চরিত্রবান হওয়া উচিত, উন্নীত হওয়া উচিত উন্নত আদর্শে। কিন্তু যখন আল্লাহ পাক দেখবেন মানুষ সীমালংঘন করছে, তখন তিনি কঠিনভাবে পাকড়াও করবেন।

আমি প্রথমে চারটি মনযিলের কথা বলছি

আল্লাহ চাহেতো আমি আমার বয়ানকে সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করছি। আমি চারটি মনযিলের কথা বলছিলাম। ১. মায়ের গর্ভ। ২. দুনিয়ার গর্ভ। ৩. কবরের গর্ভ ও ৪. পরকাল। কিন্তু কবর ও আখেরাত আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে।

চারটি স্তর

দুনিয়ার মধ্যেও চারটি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তর হলো দাওয়াতের সৃষ্টি। দাওয়াতের কাছে সম্পৃক্ত হওয়া। দ্বিতীয়ত একাজে শরীক হবার পর কাজের বিন্যাস করা, তরতীব করা। কিছু সময় ফাঁকাও রাখা।

ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা এবং পরীক্ষা

আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রতি নেয়ামত দান করেন। বান্দা আদায় করে কৃতজ্ঞতা। মাঝে মধ্যে আল্লাহ তায়ালা কষ্টও দেন যেন বান্দা ধৈর্য ধারণ করে।

যদি কুরআন, হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের জীবন সামনে রাখা হয় তাহলে দাওয়াতের কাজের মাঝে যে ফাঁকা সময় থাকে তাও দাওয়াতের কাজে ভরে ওঠবে। কাজের ক্ষেত্রে যে উত্থান-পতন সৃষ্টি হয় আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ মোতাবেক চালিত হলে, নিজের কাজের বিন্যাস সে আলোকে করলে আল্লাহর পক্ষ হতে গায়েবী সাহায্য আসবে। এটা আল্লাহ তায়ালার অঙ্গীকার।

মুহ্তারাম বন্ধুগণ!

যখন দাওয়াতের পরিবেশ সৃষ্টি হবে তখন ঈমানের পানি বর্ষিত হবে। যখন ঈমানের পানি বর্ষিত হবে তখন জাহেরী আমল তৈরি হবে। নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ, সদকা, খয়রাতও খুব হবে।

এসব জাহেরী আমল কখনও কবুলও হয় আবার কখনও কবুল হয় না। আমল মকবুল হওয়ার পদ্ধতি হল, নিজের মধ্যে ঈমানী গুণ সৃষ্টি। ঈমানী গুণ হল তাক্ওয়া, তাওয়াক্কুল, ধর্ম, কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি। এসব গুণাবলীতে সমৃদ্ধ হতে পারলে আল্লাহ খুশি হবেন। আল্লাহ খুশি হলেই আমল কবুল হবে। গায়েবী সাহায্য আসবে।

বাতেলপন্থী তিন প্রকার

যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে গায়বী সাহায্য আসবে তখন বাতেলপন্থীরা তিনভাগে বিভক্ত হবে। এক শ্রেণীতো এমন হবে যারা সংশোধন হয়ে যাবে। দ্বিতীয় শ্রেণী যারা নিশ্চুপ হয়ে যাবে। তৃতীয় শ্রেণীর বাতিল, যারা কখনো হেদায়াত হবে না। বরং অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে মহা দর্পে।

কিভাবে বদলে যায়

দেখুন, আবু জাহিলের পুত্র রূপান্তরিত হলেন হযরত ইকরিমায়। আবু জাহিলের ভাই হলেন হযরত হারিস ইবন হিশাম। আবু সুফ্য়ানের স্ত্রী হয়ে গেলেন হযরত হিন্দাহ্ 'রাযিয়াল্লাহু আন্হুম।'

মুহ্‌তারাম বন্ধুগণ!

একদল তো হেদায়াত পেয়ে যাবে। সরল পথে চলে আসবে। আরেক দল সত্য পথে আসবে না। তবে উৎপাতও করবে না। নীরব হয়ে যাবে। যেমন বনূ নাজরানের প্রতিনিধি দল। রাসূল (সাঃ)- এর দরবারে এসেছিল। কিন্তু তারা ভাবল, আমরা যদি যুদ্ধে অবতীর্ণ হই, কসম খাওয়া-খাওয়ি করি তাহলে বরবাদ হয়ে যাব। তখন তারা চুপসে গেল।

এদের অবস্থা ছিন্নমূল তৃণের মত

তবে তৃতীয় একটি দল আছে, যারা মোকাবেলায় নেমে আসে। অন্যায়ের উপর ঔদ্ধত্যপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। যেমন, ফেরাউন, কারূন, হামান, আদ সম্প্রদায় প্রভৃতি।
এই তৃতীয় দল যখন হঠকারিতায় মেতে ওঠে, হয়ে ওঠে চরম উগ্র তখন তারা সত্যপন্থী দ্বীনের কর্মীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, প্রচন্ড উগ্রতায় ছেয়ে ফেলে সবকিছু।

যেমন– যখন বৃষ্টির পানি পড়ে তখন প্রচুর নালা প্রবাহিত হয়। আর সেই স্রোতকে ছেয়ে যায় ছিন্নমূল তৃণলতা, এর উপমা এমন, আপনি যখন সোনা-রূপার অলংকার তৈরি করেন তখন আগুন জ্বালিয়ে তার উপর সোনা-রূপাকে গলিয়ে নেন। সোনা-রূপা গলে যাবার পর তার ভেতরকার খাদগুলো উপরে ভেসে ওঠে, ছেয়ে যায়। ঠিক এভাবেই বাতেলপন্থীরা হক পন্থীদের উপর ছেয়ে যায়। কিন্তু এই ময়লা আবর্জনা ঝেড়ে ফেলা হয়। অবশিষ্ট থাকে স্বর্ণ-রূপা। অনুরূপ আল্লাহ তায়ালাও বিকৃত গলিত লোকদেরকে ময়লা-আবর্জনার মত ঝোরে ফেলেন। অবশিষ্ট প্রতিষ্ঠিত থাকে হকপন্থীরা। সর্বযুগে আমাদের আল্লাহর এটাই নিয়ম।

ফেরাউন ও তার বাহিনী

ফেরাউনের বাহিনী ময়লা-আবর্জনার মত বনী ইসরাঈল ও হযরত মূসা (আঃ)-এর উপর ছেয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ছুঁড়ে মেরেছেন। বেঁচে গেছেন হযরত মূসা (আঃ) ও বনী ইসরাঈল।

নাম জালূতের; সফলকাম তালূত

অনুরূপভাবে জালূতও আবর্জনার মত ছেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ পাক তাকে ছুঁড়ে মেরেছেন। প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন হযরত তালূত। হয়েছেন পুরস্কৃত।

আবু জাহিল ও কায়সার-কিসরার ধ্বংসাত্মক পরাজয়

বদরে ঘটেছে অনুরূপ কাহিনী। আবু জাহিল সদল বলে ছিন্নমূল তৃণের মত ছেয়ে গেছে। আল্লাহ ছুঁড়ে মেরেছেন যথাসময়ে। প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন মুমিনগণ।

খন্দকযুদ্ধে বনূ নজর ও বনূ গিতফানের লোকেরাও ছেয়ে গিয়েছিল একই কায়দায়। যথাসময়ে এদেরকেও সাফ করে ফেলেছেন পরম দয়ালু আল্লাহ। পরিণামে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে হক।

হযরত উমর (রাঃ)'র যুগে কায়সার-কেসরা উদ্যত হয়েছিল মহাবিক্রমে। ছেয়ে গিয়েছিল সাহাবায়ে কেরামের উপর। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ছুঁড়ে মেরেছেন। রয়ে গেছেন ঈমানদার কাফেলার সম্মানিত সাহাবীগণ।

বর্তমান যুগ সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই, সময়ও নেই, সুযোগও নেই। হ্যাঁ, ভবিষ্যতের কি হবে, সেই সংবাদ আমাদেরকে আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (সাঃ) পূর্বেই দিয়ে রেখেছেন। আর তা হল, দজ্জাল তার সহস্র সৈন্যবাহিনী নিয়ে ঈমানদারদের উপর ছেয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ছুঁড়ে মারবেন।

ইয়াজুজ-মা'জূজের ধ্বংস

সর্বশেষ পৃথিবীতে পদার্পণ করবে ইয়াজূজ-মা'জূজ। ইরশাদ হচ্ছে–

إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِى الْأَرْضِ (پاره/ ١٦)

'নিশ্চয় ইয়াজূজ-মা'জূজ পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।'

ইয়াজূজ-মা'জূজ যুলকারনাইনের দেয়াল ডিঙিয়ে ছেয়ে যাবে চারদিকে। হত্যা করবে মানুষ। সমুদ্রের পানি পান করে শুকিয়ে ফেলবে। ছেয়ে ফেলবে ঈমানদারগণকে। ঈমানদারগণ আশ্রয় নিবেন পর্বতগুহায়।

حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ (پاره/١٧)

'অনন্তর যখন ইয়াজূজ ও মা'জূজকে মুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা সকল উন্মুক্ত স্থান থেকে দ্রুত ছুটে আসবে।'

আল্লাহ তায়ালা ইয়াজূজ-মা'জূজকে ফোঁড়ায় আক্রান্ত করে হত্যা করবেন। ঈমানদারগণ তখন বেরিয়ে আসবে। দুআ করবে! আল্লাহ তায়ালা আকাশ

থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। এতে খুব বরকত হবে। ইয়াজূজ-মা'জূজ হারিয়ে যাবে। চারদিকে দীন ঈমান ও হেদায়তের আলো ছড়িয়ে পড়বে।

দজ্জাল, ইয়াজূজ-মা'জূজসহ সকল জঞ্জালই পরিষ্কার করে ফেলবেন আল্লাহ তায়ালা। যিনি প্রথমে করেছেন এখনও করতে পারেন। তিনি তাঁর স্বকীয় শক্তিতে বলীয়ান।

বন্ধুরা আমার! আল্লাহ তায়ালা ঈমান ও হিদায়াতের যে বীজ রূহের জগতে সকল মানুষের ভেতর বপন করেছিলেন সে বীজ আবু জাহিল, ফেরাউন সকলের হৃদয়েই বপন করেছিলেন। কিন্তু সেই বীজ বৃক্ষে রূপান্তরিত হবে কখন?
যখন আসমানী ওহীর পানি পড়বে তখনই সে বীজ থেকে দ্বীনের বৃক্ষ গজাবে।

দ্বীনের বৃক্ষকে বাঁচান

দ্বীনের এই বৃক্ষকে ধ্বংসের হাত থেকে বাচাঁতে হবে। ধ্বংসাত্মক সকল কিছু থেকে হেফাযত করতে হবে। ধ্বংসাত্মক গুণাবলী হল দুনিয়া কামনা, স্বার্থপরতা, অহংকার, বড়ত্বভাব, লোক দেখানো মানসিকতা। এছাড়াও রয়েছে আরও ধ্বংসাত্মক স্বভাব।

এসব স্বভাব দ্বীনের বৃক্ষকে ধ্বংস করে দেয়। এই জন্যে চাই খোদা প্রেমের আগুন। যে আগুন এসব নষ্ট স্বভাবকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে ফেলবে। আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন জায়গায় আগুন ও পানির উপমা দিয়েছেন। কুরআনুল কারীমের প্রথম পারার মধ্যেও এই উপমা আছে।

আগুন ও পানির উপমা

এ সর্ম্পকে কুরআনে কারীমের আয়াত শুনাচ্ছি আপনাদেরকে,

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا
(پاره/ ۱۳)

'আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন অতঃপর স্রোতস্বীরা প্রবাহিত হতে থাকে নিজ নিজ পরিমাণ অনুযায়ী। অতঃপর স্রোতধারা স্ফীত ফেনারাশি উপরে নিয়ে আসে।'

এ ছিল আল্লাহ প্রদত্ত পানির উপমা। তারঃপর দিয়েছেন আগুনের উপমা-

وَمِنْ مَّا يُوقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِى النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ اَوْمَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهٗ (پاره/١٣)

'এবং অলংকার অথবা তৈজসপত্রের জন্যে যে বস্তুকে আগুনে উত্তপ্ত করে, তাতেও তেমনি ফেনারাশি থাকে।'

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা বলেন, পানির উপরতো ময়লা আবর্জনা থাকেই। অধিকন্তু যে সব পদার্থ যেমন স্বর্ণ-রূপাকে অলংকার তৈরির জন্যে আগুনে পোড়াও সেগুলোর উপরও ময়লা আবর্জনা ছেয়ে থাকে।

كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ-

'আল্লাহ তায়ালা এভাবেই হক ও বাতিলের উপমা পেশ করেন।' সত্য হলো স্বর্ণ ও রূপার মত। বাতিল হলো ময়লা-আবর্জনার মত। অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে-

فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً

'অতএব ফেনাতো শুকিয়ে খতম হয়ে যায়।'

অর্থাৎ ময়লা-আবর্জনাকে সরিয়ে ফেলা হয়, পরিষ্কার করে ফেলা হয়।

وَاَمَّا مَايَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ

'এবং মানুষের জন্যে যা উপকারী তা জানবে অবশিষ্ট থাকে।'

كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ

'আল্লাহ তায়ালা এভাবেই দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন।'

সম্মানিত বন্ধুগণ!

আমাকে আরেকটি কথা অবশ্যই বলতে হচ্ছে। কথাটি হচ্ছে, যদি খাঁটি পানি হয় কিংবা খাঁটি সোনা-রূপা হয় তাহলে তো ময়লা আলাদা করে নিক্ষিপ্ত করা হয়। কিন্তু যদি নিচের পানির মধ্যেই আবর্জনা মেশানো থাকে, সোনা-রূপার মধ্যেই খাদ থাকে তাহলে কিন্তু এটা ভাল লক্ষণ নয়। তাই দ্বীনের খাদেমদের জন্যে উচিত দ্বীনী কাজকে সবধরনের আবর্জনা মুক্ত রাখা, সম্পদ কামনা, স্বার্থপরতা ইত্যাকার অন্যায় গুণাবলী থেকেও দূরে থাকতে হবে। এই জন্যে আল্লাহর দরবারে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করা উচিত। নিজের প্রতি সযত্ন দৃষ্টি রাখা উচিত। সতর্ক দৃষ্টিতে কুরবানীর মাধ্যমে সামনে অগ্রসর হওয়া উচিত।

দাওয়াতকেই নিজের কাজ বানাতে হবে

এই নিয়ত করে নিন, ইনশাআল্লাহ যতদিন এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকব আমরা দাওয়াতের কাজকেই নিজেদের কাজ বানাব। এই দৃষ্টিভঙ্গি সামনে রেখেই কাজ করে যেতে হবে। নারী-পুরুষ-যুবক কিশোর সকলকে।

কুরবানীর দ্বারাই দ্বীনী পরিবেশ সৃষ্টি হয়

যেমন রাসূল (সাঃ) তার যুগে দ্বীনের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। সে পরিবেশ সৃষ্টি করতে তাঁকে দিতে হয়েছে বেশুমার ত্যাগ অজস্র কুরবানী। সে কুরবানীর আলোয় ঈমানী পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে জগৎজুড়ে।

হযরত উমর (রাঃ) কত সর্তক পাহারাদারী করতেন, সর্বদাই অস্থির ও চিন্তিত থাকতেন। আল্লাহর অপার মেহেরবানী, তাঁর অসীম অনুগ্রহ, অনেক পরিবার আল্লাহ এমনভাবে তৈরি করে দিয়েছেন যারা সর্বদাই আল্লাহর বান্দাদের কথা ভাবে, সকল প্রকার ত্যাগ ও বিসর্জন দিয়ে যাচ্ছে তাঁরা অকাতরে।

দ্বীনদার ও বুদ্ধিমতি স্ত্রী

এক ব্যক্তি এক বছরের জন্যে তাসকীল হল। জামাতে যাওয়ার জন্যে সে তৈরিও হয়ে গেল। স্ত্রীর সাথে গিয়ে পরামর্শ করল। স্ত্রী ছিল খুবই দ্বীনদার। স্ত্রী বললঃ তুমি আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে যাও। বাচ্চাদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি আমিই লক্ষ্য রাখব। এভাবে আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে যাওয়া কোন কঠিন কাজ নয়। এভাবে স্বামী আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পড়লে স্ত্রীও সওয়াবের অংশীদার হবে।

স্বামী আল্লাহর রাস্তার বেরিয়ে পড়ল। স্ত্রী সন্তানদের দেখাশোনা করতে থাকল। যখন ঈদের দিন এল তখন মহল্লার বাচ্চারা এই মুবাল্লিগের সন্তানদেরকে খোঁচাতে লাগল। বলতে লাগলঃ তোমাদের আব্বা তো জামাতে চলে গেছেন। আমাদের আব্বা আমাদের সঙ্গে আছেন। আজ আমাদের ঈদ। মহাখুশীর দিন। দেখ কত ভাল ভাল কাপড়! কত ভাল ভাল খাবার! আমরা ঘুরতে-বেড়াতে যাব। তোমাদেরকে কে নিয়ে যাবে?

বাচ্চারা ছোট। তারা এসব শুনে কাঁদতে লাগল। তাদের কান্নার রোল ওঠেছে। তারা ছুটে এসেছে মায়ের কাছে। এই তাদের বাপকে বাইরে রেখে প্রথম ঈদ। বাচ্চারা মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। কাঁদছে তাদের মা।

তায়েফে রাসূল (সাঃ) এর কুরবানী এবং দু'আ

সম্মানিত বন্ধুগণ!

এই দ্বীন কুরবানীর দ্বারাই চলেছে। রাসূল (সাঃ) ও এই দ্বীনের জন্যে প্রচুর কুরবানী দিয়েছেন। সীমাহীন ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

তায়েফের প্রান্তরে রাসূলের (সাঃ) প্রতি এমনভাবে পাথর বর্ষণ করা হয়েছিল যে, তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন সাহাবী যায়েদ ইবন হারিছাহ (রাঃ)। তিনি রাসূলকে (সাঃ) কাঁধে তুলে উৎবার বাগানে নিয়ে এসেছিলেন। পানি ঢেলেছিলেন। তারপর তিনি চেতনা ফিরে পেয়েছেন। চোখ খুলেছেন। ফেরেশতা নেমে এসে খাড়া করলেন, বললেনঃ হে রাসূল! আপনি অনুমতি দিলে উভয় পাহাড়ের চাপে এদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেব।

রাসূল (সাঃ) বলেছিলেন, তারা যদিও মানছেনা, হতে পারে তাদের ঔরষজাত সন্তানরা আমার কথা মানবে। আমি তাদেরকে সমস্যায় ডুবিয়ে মারতে চাইনা। আমি চাই তাদের সমস্যা ও সংকটের উত্তরণ-সমাধান!

তাদের সন্তানরা কারা? বনূ সাকীফ! যারা রাসূল (সাঃ)- কে বর্ণনাতীত কষ্ট দিয়েছিল।

মুহাম্মদ ইবন্ কাসিম শুধু ঈমানই আনেননি, দ্বীনের দা'ঈ ছিলেন

এই কবীলায়ে বনূ সাকীফেই জন্ম গ্রহণ করেছেন মুহাম্মদ ইবন কাসিম (রাঃ)। তিনি যখন সিন্ধুতে এসেছেন লোকেরা তার পবিত্র জীবনের পরশে ঈমান গ্রহণ করেছে। তাঁর বংশ বিস্তার হয়েছে।

আমাদের এই দেশে যত কোটি মুসলমান নজরে পড়ে, আমাদের পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশ-পাকিস্তানে যে কোটি কোটি মুসলমান গোচরীভূত হয়, তারা সকলেই মুহাম্মদ ইব্ন কাসিমের কুরবানীর রসে সিক্ত। মাঝখানে আরও অনেক দা'ঈ এসেছেন। তাদেরকে অস্বীকার করছিনা।

এই মুহাম্মদ ইব্ন কাসিম তায়েফে রাসূল (সাঃ)-এর কুরবানীর ফসল। সুতরাং যতখানি ঈমান লাভ করেছি এটা তায়েফের প্রান্তরে নবীজীর কুরবানীর বরকতেই পেয়েছি।

বাচ্চারা হেসে ওঠল

আমি আপনাদেরকে সেই কাহিনী শুনাচ্ছিলাম যে, তার স্ত্রীবাচ্চাদেরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করল। কান্না যখন থামল তখন মা তার

বাচ্চাদেরকে বসিয়ে বলল, বাচ্চারা শোন! মহল্লার ছেলেদের আজ ঈদ, কালবাসি, পরশু খতম। আর আমাদের ঈদ হবে জান্নাতে। আর সে ঈদ কোন দিন বাসি হবে না। দিন কি কেবল বাড়তে থাকবে। তারপর বেহেশতে কি কি নেয়ামত পাওয়া যাবে এ সম্পর্কিত সমস্ত আয়াত তিলাওয়াত করে শোনাল। বেহেশতের আঙ্গুর কেমন হবে, খেজুর কেমন হবে, বেহেশতের দুধ কেমন হবে, মধু কেমন হবে–ইত্যাদি। এসব কথা শুনে এখন বাচ্চারা হেসে ওঠল। বলে ওঠল, আম্মু, তাহলে তো বেশ মজাই হবে। কত সুন্দর! আমাদের ঈদ কখনো পুরনো হবে না।

এবার বাচ্চারা বাইরে গেল। অন্য বাচ্চাদের সাথে কথা হল। এরা তাদেরকে বলল, বস! তোমাদেরকে সুন্দর গল্প শোনাব!

বাচ্চারাও দা'ঈ

তারা বলল ঃ দেখ, তোমাদের ঈদ কিন্তু কালই পুরনো হয়ে যাবে আর পরশু তো শেষ। আমাদের আম্মু বলেছেন, বেহেশতে আমরা এমন ঈদ পাব যা কোন দিন পুরনো হবে না। সদা সবুজ সুন্দর জীবন্ত মনে হবে। তারাও বেহেশতের বিচিত্র নেয়ামতের কথা শোনাতে লাগল। অন্য বাচ্চারা নীরবে বসে শোনছে। দেখা যাচ্ছে, একই সময় বাবা-মা-সন্তান সকলেই দ্বীনের দাওয়াত দিচ্ছে। সারা পৃথিবী জুড়ে এই পরিবেশ কায়েম করতে হবে। করবেন তো আল্লাহ। হাত পা মারা আমাদের কাজ। একটু চেষ্টা করা আমাদের দায়িত্ব।

হতে পারে এই বাচ্চাদের বাবা যে এলাকায় তাবলীগের কাজ করছে সে এলাকায় লোকেরা তাবলীগকে ভাল জানে না। তাদেরকে কেউ হয়ত বলে দিয়েছে এই তাবলীগীরা দরূদ শরীফ পড়ে না। এদের ভেতর রাসূল (সাঃ) এর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নেই। এ কারণে গ্রামের লোকেরা জামাতের লোকদেরকে গ্রামে দাঁড়াতেই দেয়নি। তাই তারা অবস্থান নিয়েছে গ্রামের বাইরে গাছের তলায়।

গ্রামের লোকেরাও অসহায়। কি করবে! তারা যা শুনেছে তাই বিশ্বাস করেছে। তাই কান্ড! মারছেও নবীর ভালোবাসায়। মার খাচ্ছেও নবীর ভালোবাসায়। আসল অপরাধী হলো, যারা এদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও ভুল ধারণার সৃষ্টি করেছে। আবার এসব ক্ষিপ্ত লোকেরা যখন কাজের সাথে জড়িত হয়ে যায় তখন খুব কাজ করে।

প্রহরী পেয়ে গেল কাবা মূর্তি ঘর থেকে

এক বিকৃতমনা। গোমরাহ্ লোক! আল্লাহ তায়ালা তাকে কবুল করলেন। তাওফীক দিলেন। সে এক জায়গায় জামাত নিয়ে গেল। গ্রামের লোকদের কে আগেই কেউ ভুল ধারণা দিয়ে রেখেছিল। গ্রামে জামাত পৌঁছতেই এক হৈ চৈ পড়ে গেল। বের হও। মার। পেটাও। অতঃপর জামাতকে গ্রাম থেকে তাড়াবার জন্যে এক মদখোরকে পাঠাল। সে এসে গাল-মন্দ দিতে লাগল। বকতে লাগল, বের হয়ে যাও। নবীজীর শানে বেয়াদবীকারীরা এক্ষণি বের হও, ইত্যাদি.....।

জামাতের যিনি আমীর তিনি একসময় এই টাইপের মাস্তান ছিলেন। তিনিও এখন চিৎকার করে বলতে লাগলেন–

আরে কাপুরুষ! নবীজীর শানে বেয়াদবীকারীকে শুধু গালি দিচ্ছ। হিজড়া, নির্লজ্জ কোথাকার। এদেরকে তো গুলি করে উড়িয়ে দেয়া দরকার। কারণ, নবীজীর শান, নবীজীর মর্যাদা! সহজ কথা!!

এবার আমীর নবীজীর মর্যাদা সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করলেন। এবং খুব উঁচু কণ্ঠে, স্পষ্ট স্বরে। তখন শরাবীর মুখও আকৃষ্ট হয়ে পড়ল এদিকে। সে কাছে এসে বসল। কথা শুনল। সবশেষে বলল, 'আমাদেরকে বিরাট বড় ধোকায় ফেলে রাখা হয়েছে।' এই বলে সে বাইরে বেরিয়ে এল। জামার হাত গুটিয়ে গ্রামের লোকদেরকে বলল, চল, সকলে মিলে এরা কি বলে আগে শোন! নইলে তোমাদেরকেই পেটাই করব।

সকলেই মসজিদে এলো। কথা শুনল। জানিনা, এখন সেখান থেকে কত জামাত বেরুচ্ছে।

আমাদের কিছু গরম মেজাজী কর্মী এমন হয়। সময় মত তাদের উত্তেজনাও অনেক বড় কাজে আসে। কিন্তু তাদেরকে এ ব্যাপারে আমি উৎসাহিত করছিনা। কারণ, কোন কোন ক্ষেত্রে এই কঠোরতার ফল বিপরীতও হতে পারে। নম্রতার সাথে কাজ যতটুকু হয় ততটুকু ভাল। তাছাড়া কঠোরতা করাটাও সকলের কাজ নয়।

হযরত উমর (রাঃ) খুব কাঁদলেন

হযরত উমর (রাঃ)'র কঠোরতার অনুকরণ সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, তাঁর কঠোরতার মধ্যেও তাকওয়া ছিল।

ব্যবসায়ীদের একটি কাফেলা মদীনায় আসলো। হযরত উমর (রাঃ) ভাবলেন, আবার চুরি-দারি হয়ে যায় কি-না। তিনি নিজেই প্রহরায় লেগে

গেলেন। সঙ্গে নিলেন সাহাবী হযরত ইব্‌ন আউফকে। সেখানেই উভয়ে তাহাজ্জুদের নামাযও আদায় করলেন।

কাফেলার ভেতর থেকে বারবার একটি বাচ্চার কান্নার আওয়াজ আসতে ছিল। হযরত উমর (রাঃ) গিয়ে তার মাকে বললেন: বাচ্চাটাকে কাঁদাচ্ছ কেন? শেষ রাত্রে আবার যখন কান্না শুনতে পেলেন তখন গিয়ে বললেন ঃ তুমি ভাল মা নও! তোমার বাচ্চা সারারাত আরামে ঘুমুতে পারেনি। মহিলা বলে ওঠল, আরে আল্লাহর বান্দা! তুমিতো আমাকে অস্থির করে ফেলেছ। আসল ব্যাপার হল, আমি ওকে দুধ ছাড়াতে চাচ্ছি। কিন্তু সে দুধ ছাড়ছে না। তাই সে অস্থির থাকে। উমর (রাঃ) বললেন, এত তাড়াতাড়ি দুধ ছাড়াবার কারণ কি? মহিলা বলল, উমর ইব্‌ন খাত্তাব দুধ ছেড়েছে এমন বাচ্চারই ভাতা জারী করেন। আমি ভাতা পাওয়ার জন্যে দুধ ছাড়াচ্ছি যেন আমার খরচের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা হয়।

একথা শোনার পর হযরত উমর (রাঃ) খুব কাঁদলেন, আর বললেন, 'উমর! তোমার রাজ্যে কত শিশুকে না জানি তাদের মা এভাবে কাদাচ্ছে! কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহর সামনে তোমাকে উপস্থিত করা হবে তখন এই শিশুদের কান্নার তুমি কি উত্তর দিবে?'

উমরের সামনে কিয়ামতের সম্পূর্ণ চিত্র উপস্থিত ছিল। তাই তিনি খুব কাঁদলেন।

আসল মানুষের কণ্ঠের হার

হযরত উমরের সামনে এই আয়াত ছিল,

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِىْ عُنُقِهٖ- وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰهُ مَنْشُوْرًا (پاره/)

'প্রত্যেক মানুষের কণ্ঠে একটি হার অবধারিত করে দেব। (ভাল-মন্দ আমলের ফলস্বরূপ) এবং কিয়ামতের দিন একটি খোলা কিতাব (আমলনামা) তার সামনে বের করে দেব, সে তা প্রত্যক্ষ করবে।' সেখানে তার ভাল-মন্দ আমলের বিবরণ থাকবে। তারপর আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

اِقْرَاْ كِتٰبَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا (پاره/١٥)

'তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর! আজ তোমার হিসাবের জন্যে এই কিতাবই যথেষ্ট।' তোমার আমলনামায় কোন কোন দফার অপরাধ আছে তাতেও নজর বুলিয়ে নাও আর কোন অপরাধের কি শাস্তি কুরআন থেকে তাও জেনে নাও। কুরআন আরশে খোদার সামনে ঝুলন্ত আছে। তুমিই এবার তোমার হিসাব করে নাও।

মানুষ হয়রান ও বিচলিত হয়ে পড়বে। ছোট-বড় সকল অপরাধই চোখের সামনে ভেসে ওঠবে। মানুষ বলে ওঠবে,

مَالِ هٰذَا الْكِتَابِ لَايُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَاكَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰهَا وَوَجَدُوْا مَاعَمِلُوْا حَاضِرًا- وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا- (پاره/ ١٥)

'এ কেমন কিতাব! ছোট-বড় সব কিছুই হিসাবে এনেছে। তারা তাদের কৃতকর্ম সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে। তোমার প্রভু সামান্যতমও অত্যাচার করবেন না।' হযরত উমরের (রাঃ) সামনে এসব আয়াত উপস্থিত ছিল। তাই তিনি হাউমাউ করে কাঁদলেন। ঢেকুর তুলে কাঁদলেন। ফজরের নামায পড়ালেন। তখনও কান্নার নীরব তরঙ্গ তাঁকে কম্পিত করছে।

হযরত উমরের ফরমান

নামাযের পর তিনি তাঁর কর্মকর্তাদেরকে ডাকলেন। ডেকে বললেনঃ জানিনা কত শিশু কাঁদছে। শিশুদেরকে জন্মের সাথে সাথেই ভাতা জারীর ব্যবস্থা করা হোক। সর্বত্র এ মর্মে পত্র প্রেরণ করা হোক যেন কোন মা তার সন্তানকে না কাঁদায়।

অনেকেই হযরত উমরের (রাঃ) কঠোরতার অনুশীলন করে অনুকরণ করে। কিন্তু তাঁর দয়া ও তাকওয়ার অনুকরণ করে না।

বন্ধুরা আমার!

এই তাকওয়া আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে।

যখন সেই আল্লাহর রাস্তার দাঈ তাঁর স্ত্রী ও সন্তানরা কুরবানী দিয়েছে তখন সেই এলাকায় সকলেই দ্বীনের কাজের জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেছে। তাই আমাদের সকলেকেই সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে হবে। মাকামী কাজ করতে হবে। পরিবারের লোকদেরকে নামাযের প্রতি খুব জোর দিতে হবে।

নিজের নামায যেন কখনো নষ্ট না হয় সেদিকে খুব সর্তক দৃষ্টি রাখতে হবে। ঘরের মধ্যে তা'লীমের ব্যবস্থা হতে হবে। আড়াই ঘন্টা মসজিদ আবাদের কাজে ব্যয় করতে হবে। গাশতেও যেতে হবে। শেষ রাতে ওঠে আল্লাহর দরবারে খুব কান্নাকাটিও করতে হবে।

জামাতে জামাতে ঘুরে নবীদের মত দরদ সৃষ্টি করতে হবে

মুহতারাম বন্ধুরা!

চতুর্দিক থেকে মানুষ মরছে আর জাহান্নামে যাচ্ছে। আমাদের অন্তরে এর কোনই চিন্তা নেই। এ ধরনের উদাসীনতাতো কাম্য নয়, উচিত নয়।

জামাতের সাথে ঘুরে ঘুরে নবীদের মত পেরেশানী, নবীদের মত ব্যথা ও বেদনা, নবীদের মত চিন্তা ও অস্থিরতা নিজেদের ভেতর সৃষ্টি করতে হবে। যদি এই দরদ পেরেশানী আর চিন্তার সৃষ্টি হয় তাহলে অযোগ্যের মাধ্যমেও আল্লাহ পাক দ্বীনের কাজ নিবেন। গরীব ধনী, ছোট আলেম বড় আলেম সকলের দ্বারাই দ্বীনের খেদমত নিবেন। কাজ নেয়ার মালিক আল্লাহ।

জমে বসুন; সাওয়াব হাসিল করুন

এই মুহূর্তে আপনাদের প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ, আপনারা সকলেই খুব জমে বসুন যেভাবে নীরব-শান্তভাবে বয়ান শুনেছেন। এখন আমাকে তাশকীল করতে হবে। আপনারা যদি জমে বসেন আর এই কারণে তাশকীল হয়, তাশকীল কাবুতে আসে তাহলে এর জন্যে আপনারা সওয়াব পাবেন। কিয়ামতের দিন তার প্রতিফল স্বচক্ষে দেখতে পাবেন।

(অতঃপর তাশকীল..........)

আমার আন্তরিক দোয়া

যারা এখন নাম লিখিয়েছে, সময় বাড়িয়েছেন আমার মন চায় তাদের জন্যে দুআ করি। তাদের জান-মাল, ঈমান, ইজ্জত-আবরু, দোকান-পাট, ব্যবসা-বাণিজ্য সব কিছু আল্লাহপাক হেফাযত করুন। বরকত নসীব করুন। তাঁদের বংশ আল্লাহ তায়ালা অনেক বড় বড় দা'ঈ সৃষ্টি করুন। আল্লাহ তায়ালা তাদের সকল প্রয়োজনকে সুস্থতার সাথে গায়েব থেকে পূরণ করে দিন।

এই দোয়া তাদের জন্যে, যারা এসেছিলেন তো শুধু বয়ান শোনার জন্যে কিন্তু দাঁড়িয়ে তিন চিল্লায় নাম লিখিয়ে দিয়েছেন; এক চিল্লার জন্যে এসে তিন চিল্লায় নাম লিখিয়েছেন

দু'আ ....

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ- الٓمّٓ - اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّاهُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ـ وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ ؛ يَااَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ؛ رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ؛ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّاتَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعَزُّالْاَكْرَمُ؛

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّكَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا؛

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهٖ عَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ ـ مِنْهُ مَالَمْ نَعْلَمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّكُلِّهٖ عَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ ـ مِنْهُ مَالَمْ نَعْلَمْ؛

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَئَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ـ

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের গোনাহ্গুলো ক্ষমা করে দাও!

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সকল অপরাধ মোচন করে দাও!

হে আল্লাহ! আমরা তোমার পাপী বান্দা!

হে আল্লাহ! আমরা তোমার অপরাধী বান্দা!

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের ভুলত্রুটিগুলো মাফ করে দাও!

হে আল্লাহ! এই পুরো মাহ্ফিল তোমার সামনে হাত তুলে বসে আছে!

হে আল্লাহ! এই সম্প্রসারিত হাতগুলো কবুল কর!

হে আল্লাহ! হেদায়াত আলো ও রহমতের দরজা প্রশস্ত করে দাও!
বিপদ মুসিবত পেরেশানী অস্থিরতা পথভ্রষ্টতা ও গোমরাহীর সকল পথ বন্ধ করে দাও!

হে আল্লাহ! তুমি ভূমিকম্প থেকে বাঁচাও!

হে আল্লাহ! রক্তারক্তি থেকে বাঁচাও!

হে আল্লাহ! ঝড়-তুফান থেকে বাঁচাও!
হে আল্লাহ! তুমি আমাদের হয়ে যাও; আমাদেরকেও আপন করে নাও।
হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সকলকে ঈমানের উপর মৃত্যু দাও।
হে আল্লাহ! আমরাতো দুর্বল অসহায়!
হে আল্লাহ! তুমি তো দুর্বলদের প্রভু!
হে আল্লাহ! তুমি আমাদের প্রতি দয়া কর। অনুগ্রহ কর।
হে আল্লাহ! সারা পৃথিবীতে ইসলাম প্রচারের গায়েবী ব্যবস্থা করে দাও!
হে আল্লাহ! তোমার কোটি কোটি বান্দা ঈমান ছাড়া জীবন যাপন করছে।
হে আল্লাহ! তুমি অদৃশ্য থেকে এমন ব্যবস্থা করে দাও যেন দুনিয়ার সকল বেঈমান ঈমানদার হয়ে যায়।
হে আল্লাহ! আমাদের ঈমানের মধ্যে শক্তি দাও!
হে আল্লাহ! আমাদেরকে শক্তি দাও!
হে আল্লাহ! দুনিয়ার সমগ্রজাতির হেদায়াতের ফয়সালা কর।
হে আল্লাহ! হযরতজী (মাওলানা এনামুল হাসান সাহেব) কে সুস্থতা, শক্তি, হিম্মত ও স্বাস্থ্য দান কর! অনুগ্রহ কর!
হে আল্লাহ! তুমি অসুস্থদের পূর্ণ ও আশু সুস্থতা দান কর!
হে আল্লাহ! আমাদের পেরেশানীকে দূর কর।
হে আল্লাহ! ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধের গায়েবী ব্যবস্থা করে দাও!
হে আল্লাহ! যে সব ছেলে-মেয়েরা বিয়ের উপযুক্ত তাদের জন্যে উত্তম জোড়া সৃষ্টি করে দাও!

হে আল্লাহ! যারা দু'আর জন্যে মৌখিক বলেছে কিংবা চিঠি লিখেছে অথবা যারা দু'আর আশা রাখে, তাদের সকলের জন্যে আমাদের জন্যে ইহকাল-পরকালের সকল প্রয়োজন গায়েব থেকে পূরণ করে দাও! দুনিয়া-আখেরাতের সকল পেরেশানী দূর করে দাও!

হে আল্লাহ! পৃথিবীর সকলের অবস্থা অস্থিরতাপূর্ণ!

তুমি অস্থিরতা দূর করে দাও!

হে আল্লাহ! পৃথিবী জুড়ে আখেরাতের পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে;

ঈমানের পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে;

ঈমানের বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে!

হে আল্লাহ! হেদায়াত কায়েম হচ্ছে!

হে আল্লাহ! হেদায়াতের পথ করে দাও! যারা জেদী স্বভাবের সীমালংঘনকারী, সত্য পথে বাধা সৃষ্টিকারী, যাদের অন্তরে তুমি মোহর এঁটে দিয়েছো; তুমি তাদেরকে, তাদের সাঙ্গ-পাঙ্গকে, তাদের আড্ডাখানাকে ধ্বংস করে দাও!

হে আল্লাহ! তুমি অনন্ত শক্তির অধিকারী!

হে আল্লাহ! তুমি বাতিলকে নিশ্চিহ্ন করে দাও! সারা পৃথিবীতে হককে প্রতিষ্ঠিত করে দাও!

হে আল্লাহ! বাতিলের আওয়াজকে প্রভাবহীন ও হকের আওয়াজকে প্রভাবপূর্ণ করে দাও!

হে আল্লাহ! এই বিশাল জলসা, দুদিন যাবত তোমার দ্বীনের কথা শুনছে। খুব আগ্রহের সাথে শুনছে; আমলের জন্যে তৈরি হচ্ছে, তাদের শোনা ও বসাকে কবুল কর।

হে আল্লাহ! জানিনা, তোমার কাছে কে কতটুকু পছন্দনীয়। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তোমার অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচাও! তোমার সন্তুষ্টি দ্বারা আমাদের জীবনকে ভরে দাও!

হে আল্লাহ! তুমি যদি অসন্তুষ্ট থাক তাহলে তো আর উপায় থাকবে না।

হে আল্লাহ! তোমার অসন্তুষ্টির যত কাজ করেছি অনুগ্রহ করে মাফ করে দাও! তোমার সন্তুষ্টির যত কাজ করেছি দয়া করে কবুল করে নাও! তোমাকে অসন্তুষ্ট করে এমন কাজ থেকে বাঁচাও!

হে আল্লাহ! আমাদের সকলের বাবা-মা, দাদা-দাদী, নানা-নানী আমাদের যত আত্মীয় ঈমানের সাথে মারা গেছে তুমি তাদের সকলকেই কবরের আযাব থেকে বাঁচাও! তাদের কবরকে আলোকিত করে দাও!

হে আল্লাহ! কিয়ামত পর্যন্ত আগতব্য সকলকে দ্বীনের দাওয়াতের জন্যে কবুল কর। খুশু-খুযুসহ নামায নসীব কর।

হে আল্লাহ! সুস্থতার সাথে আমাদের অন্তরকে দুনিয়ার ভালবাসা মুক্ত করে দাও!

হে আল্লাহ! আমাদের অন্তরে আখেরাতের ভালোবাসা সৃষ্টি করে দাও!

হে আল্লাহ! আমাদেরকে অন্যায়ের পক্ষপাতিত্ব আর অন্যের হক নষ্ট করা থেকে বাঁচাও!

হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে শত্রুদের চোখে হাসির পাত্র বানিও না।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে তোমার রহমতের ছায়ায় ঠাঁই দাও!

হে আল্লাহ! আমরা তোমার দুর্বল বান্দা! আমাদের যা চাওয়ার ছিল চাইতে পারিনি। চাওয়া ছাড়াই দয়া করে আমাদের যা প্রয়োজন তুমি তা দিয়ে দাও!

হে আল্লাহ! যেখানে যেখানে বৃষ্টির প্রয়োজন সেখানে সেখানে রহমত ও বরকতের বৃষ্টি বর্ষণ কর!

হে আল্লাহ! যেখানে যেখানে মানুষ পেরেশান আছে, বিপদগ্রস্ত আছে তুমি অনুগ্রহপূর্বক তাদেরকে বিপদমুক্ত করে দাও!

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ـ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ؛

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ـ

وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ـ

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ

نَحْمَدُهٗ وَ نُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

মুহ্তারাম বন্ধুগণ!

অন্তরের মধ্যে যখন আল্লাহ'র রুবুবিয়্যাতের বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হবে, আল্লাহ একমাত্র পালনকর্তা এই একীন যখন কলবে বদ্ধমূল হয়ে বসবে তখন সম্পূর্ণ দ্বীনের উপর চলা সহজ হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াবী বিপদ-আপদও দূর করে দিবেন। পার্থিব জ্বালা–যন্ত্রণা থেকে হেফাযত করবেন। ইহকালে নেয়ামতের সকল দরজা খুলে দিবেন। পরকালে দান করবেন অপার সুখের নিবাস 'জান্নাত।'

প্রভুত্বের অঙ্গীকার

রূহের জগতে সমস্ত আত্মাকে একত্রিত করে আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؟

'আমি কি তোমাদের প্রভু নই?' জবাবে সকলের আত্মাই জবাব দিয়েছিল ঃ হ্যাঁ, আপনিই আমাদের প্রভু, আপনিই আমাদের পালনকর্তা। আবু জাহেল ও ফেরাউনের আত্মাও একই উত্তর দিয়েছিল। ঈমানদারদের জবাবও ছিল অভিন্ন। কারণ সেখানেতো ছিল কেবল আল্লাহই– আল্লাহ। পরীক্ষার কিছু ছিল না সেখানে।

এখানে পরীক্ষা আছে। যিনি মানুষের প্রয়োজন পূরণ করেন তাকে দেখা যায় না। তবে যেখান থেকে প্রয়োজন পূরণ করা হয় সে জায়গাটা দেখা যায়। অথচ সেই জায়গাটা হলো মাধ্যম। মূলদাতা অন্য জন। সমস্যার সমাধানকারী আল্লাহ। আর মানুষ দেখতে পায় শুধু উপায়-উপকরণ গুলো। এই উপায়-উপকরণগুলো হলো পরীক্ষাস্বরূপ। রূহের জগতে এই পরীক্ষা ছিল না। সেখানে আল্লাহ ছাড়া কিছু ছিল না। তাই সমস্ত রূহ বলে দিয়েছে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ।

قَالُوْا بَلٰى

অনুরূপভাবে যখন কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে সেখানেও যেসব উপায়-উপকরণ আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে তার কোনটিই থাকবে না। দোকান–পাট, ক্ষেত-খামার, ঘর-বাড়ি, সোনা-রূপা, টাকা-কড়ি কিছুই থাকবে না। থাকবে শুধু আল্লাহ আর আল্লাহ। আর থাকবে তাঁর গায়েবী নিয়াম-অদৃশ্য বিধান।

আক্ষেপ ও নৈরাশ্য

আজ যা অদৃশ্য কাল তা দৃশ্যমান হয়ে ওঠবে। সেদিন কঠিন থেকে কঠিন বেঈমান কাফেরও আল্লাহকে প্রতিপালক হিসাবে স্বীকার করবে। ইরশাদ হচ্ছে,

رَبَّنَا اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ - (پاره/ ٢١)

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমার চোখ খুলে গেছে। কর্ণ খুলে গেছে। এখন আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠান। আমরা নেক আমল করব। আমাদের বিশ্বাস হয়ে গেছে।' এখন সব কিছুই সামনে মূর্তিমান হয়ে ধরা দিয়েছে। নেক আমলের বিনিময়ে কি পাওয়া যায় আর বদ আমলের প্রতিদানে কি শাস্তি বরদাশ্‌ত করতে হয় সবই এখন দৃষ্টির সামনে। পৃথিবীতে আমাদের কান বন্ধ ছিল। চোখেও দৃষ্টি ছিল না। যে কারণে দুনিয়াতে আমরা সব কিছুর ভিত্তি মনে করতাম বস্তুকে। অথচ আল্লাহ তায়ালা সব কিছুই রেখেছেন আমলের মধ্যে।

দৃশ্যমান পথ থেকে বিশ্বাস হটাও

এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা। তিনি রেখেছেন আমলের মধ্যে কিন্তু দেখা যায় বস্তুর মধ্যে। আর বাধ্য করেছেন, এই দেখা যাওয়ার পথ থেকে দৃষ্টিকে সরিয়ে অদৃশ্যের উপর বিশ্বাস রাখতে। যা চোখের সামনে

তা বর্জন করে আল্লাহ যা বলেছেন তার উপর একীন রাখতে বলেছেন। দৃশ্যমান পথ ছেড়ে অদৃশ্য পথকে অবলম্বন করতে বলেছেন।

দৃশ্যত অর্থ রাজত্ব আর সম্পদের দ্বারাই জীবন নির্বাহ হচ্ছে। আল্লাহ বলেছেন, জীবন গড়ার ভিত্তি হলো ঈমান ও নেক আমল। নামায, রোযা, হজ্জ্ব, যাকাতসহ যত নেক আমল আমরা করব এগুলোর দ্বারাই জীবন গড়বে। কিন্তু যে সব আমলের ভিত্তিতে জীবন গড়বে সেগুলোর প্রতিফলনটা অদৃশ্য করে দিয়েছেন। আবার বদ আমলের পরিণামে জীবন ধ্বংস হয়ে যাওয়াটা গোপন করে রেখেছেন । যথা সময়ে তা দেখা যাবে। দেখা যাবে মৃত্যুর সময়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে বদ আমল লোকদেরকে এই দুনিয়াতেও পাকড়াও করেন। আবার সৎ লোকদেরকে বিস্ময়করভাবে পুরস্কৃত করেন।

বাহ্যিক নিয়মে সকলেই সমান

এক হলো আল্লাহ তায়ালার বাহ্যিক নিয়ম। এক্ষেত্রে কাফের–মুসলমান সকলেই সমান। বৃষ্টি সকলের জমিতেই বর্ষিত হয়। ফল সকলের বৃক্ষেই ধরে। শাক-সব্জি সকলের ক্ষেতেই উৎপন্ন হয়। সকলের মুরগীর ডিমেই বাচ্চা ফুটে। সকলের জানোয়ারই দুধ দেয়। এ ক্ষেত্রে মুসলমান- কাফেরের মধ্যে কোন ফারাক নেই। একজন নবী! তাঁকেও যখন পাথর মারা হয়েছে তাঁর শরীর থেকেও রক্ত প্রবাহিত হয়েছে। নবীকে যখন যাদু করা হয়েছে তাঁকেও যাদু আক্রান্ত করেছে। কাফেরকে পাথর মারলে সেও রক্তাক্ত হবে। কাফেরের মুখে মধু ঢেলে দিলে সেও মিষ্টি অনুভব করবে। সুতরাং এই পার্থিব জগতে আল্লাহর যে বাহ্যিক নিয়ম রয়েছে তাতে সকলেই সমান-অভিন্ন।

আজ যা অদৃশ্য কাল তা-ই দৃশ্যমান

কিন্তু আল্লাহ তায়ালার অদৃশ্য ব্যবস্থাপনা গায়েবী নিয়ম গোপন করে রাখা হয়েছে। যে সম্পর্কে আসমানী কিতাব ও নবীগণের মাধ্যমে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন এবং তা মৃত্যুর সময় সকলের সামনে মূর্তিমান ও স্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠবে। আজ যা অদৃশ্য কাল তা দৃশ্যমান হবে। আজ যা আমরা দেখতে পাচ্ছি কাল তা অদৃশ্য হয়ে যাবে। বস্তুর দ্বারা জীবন গড়ে এটা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি বটে কিন্তু বদ আমলের কারণে জীবন বিনষ্ট হয়ে যাওয়াটা আমরা দেখতে পাই না। ফেরেশতা দেখতে পাই না।

বেহেশ্ত দোযখ দেখতে পাই না। কিন্তু যখন মৃত্যু এসে দাঁড়াবে! মানুষ সমাধিস্থ হবে তখন এতদিন যা প্রত্যক্ষ করত তার সবই বন্ধ হয়ে যাবে। রাজত্ব ও অর্থের দ্বারা জীবন প্রতিষ্ঠার বাস্তবতা যখন মিলিয়ে যাবে, যে সম্পদ নিয়ে যুদ্ধ-লড়াই, মারা-মারি, ফেৎনা-ফ্যাসাদ কত কিছু হতো মৃত্যুর সময় সেই সম্পদ হয়ে পড়বে একান্তই অর্থহীন, গুরুত্বহীন।

কবরের সাপকে দুনিয়ার লাঠি মারা যায় না

এখন কবরের মধ্যে যদি সাপ এসে পড়ে তাহলে দুনিয়ার লাঠি মেরে সাপ তাড়াবার কোন উপায় নেই। কবরের আগুনকে দুনিয়ার পানি দ্বারা নিভানো যাবে না। কবরে অন্ধকার সৃষ্টি হলে দুনিয়ার লাইট তা আলোকিত করতে পারবে না। লাঠি, পানি আর বিদ্যুতের অকার্যকারিতা মৃত্যুর পরে বুঝে আসবে। আমলের দ্বারা যে জীবন গড়ে ওঠে তাও প্রতিভাত হবে মৃত্যুর পরেই।

প্রকৃত সফলতা নামাযে

আমি যদি নামাযী হই তাহলে ডান দিক থেকে যে আসবে নামায তাকে প্রতিহত করবে। কিন্তু মানুষ নামায বর্জন করে লক্ষ টাকার ড্রাফ্‌ট লেন-দেনে নিমগ্ন থাকে। আর নামাযী লক্ষ টাকা ছেড়ে নামায আদায় করেছে। আমাদের বাহ্যিক দৃষ্টিতে তো লক্ষ টাকা যে পেল সেই সফলকাম আর নামাযী ব্যর্থ। তার পকেটে পাঁচ পয়সাও নেই। অথচ নামাযের মধ্যে সফলতা গোপনও অদৃশ্য হয়ে আছে। কবরে গিয়ে তা স্বমহিমায় বিকশিত হয়ে ওঠবে। পক্ষান্তরে লক্ষ টাকার কারণে যে নামায বর্জন করেছে সে যে কি ভীষণ ধ্বংস ডেকে এনেছে তাও কবরে গেলেই প্রত্যক্ষ করবে। কবরে যখন ডান দিক থেকে আযাব আসবে তা প্রতিহত করবে নামায। লাখ টাকা যে কামিয়েছে তার কাছে তো নামায নেই। আছে লাখ টাকা। আর লাখ টাকা এখানে কোন কাজেরই নয়। এখানে এসে সকলেই পরিষ্কার বুঝতে পারে। কিন্তু এখন বুঝার কোন অর্থ নেই। তাই কিয়ামতের দিন সকলেই বলবে! হে আল্লাহ! আমাদের দৃষ্টি খুলে গেছে।

অদৃশ্যে ঈমান

প্রথম রাতের চাঁদ। দেখতে দাঁড়িয়েছে। একজনের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। অন্যজন দুর্বল দৃষ্টি সম্পন্ন। তীক্ষ্ণ ও ভালো দৃষ্টি সম্পন্ন বলছে ঃ দেখ, ঐ যে চাঁদ! দুর্বল দৃষ্টির লোকটি বলছে ঃ ভাই আমিতো দেখতে পাচ্ছিনা। প্রথম ব্যক্তি

বলছে, গাছের উপর মেঘের ফাঁকের দিকে তাকাও, দেখতে পাবে। দ্বিতীয় জন বলছে ঃ ভাই গাছও দেখছি, মেঘও দেখছি, কিন্তু চাঁদতো দেখছি না। অযথাই তুমি মিথ্যা বলছ! কোথায় চাঁদ? মাগরিব নামাযের পর উভয়ে আবার গেল। এখন আকাশ আরও পরিষ্কার। ডেকে বলল ঃ এই এদিকে আয়। কি দেখা যাচ্ছে? বললঃ হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। তুমি ভাই ঠিকই বলেছ! এই ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির সংবাদকে সত্য বলে মানেনি। বরং নিজের দৃষ্টিকেই সত্য মনে করেছে। যদি সংবাদকে সত্য মনে করত তাহলে চাঁদ না দেখেও বলত, ভাই তোমার কথা ঠিক। আমার দৃষ্টিই দুর্বল। তদ্রূপ মানুষ যদি আজকে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলকে সত্য বলে স্বীকার করে নেয়, মেনে নেয়– জান্নাত– জাহান্নাম, ফেরেশতা-পুলসিরাত দেখা ছড়াই তাহলে ওটাই ঈমান। আল্লাহ তায়ালাও এর অনেক মূল্য দিবেন। অবস্থার উন্নতির পথ খুলে দিবেন। মৃত্যুর পরেও সফলতা দিবেন। আল্লাহ ও রাসূলের (সাঃ) কথাকে না দেখে মানার নামই অদৃশ্যে ঈমান– ঈমান-বিল-গায়ব।

হিমালয় পর্বত অনেক বড়

হিমালয় পাহাড় অনেক বড়। কিন্তু আপনি যদি আপনার দু'চোখে দুটি সরিষা ঢেলে দেন তারপর হিমালয় পাহাড় অবলোকন করতে চান, পারবেন না। এই বলে কোন বেকুব যদি একথা বলতে শুরু করে যে, সরিষার দানা এত বড় যে– পাহাড় থেকেও বড়। কিভাবে? সে বলল ঃ সরিষার দুটি দানা চোখে ফেলে দিলাম এখন পাহাড়ই দেখা যাচ্ছে না। সুতরাং হিমালয় পাহাড়ের তুলনায় সরিষার দানাই বড়। অনুরূপ আমলের বিনিময়ে পরকালে যে বেহেশত নসীব হবে, বিশাল বিশাল যে মর্যাদা লাভ হবে তার সাথেও বেকুব লোকেরা দুনিয়ার নেয়ামতকে তুলনা করে। কিন্তু তাদের অন্তরের চক্ষু যেহেতু বন্ধ তাই তারা আখেরাতের চাইতে দুনিয়াকে বড় মনে করে। অথচ এই দুনিয়ার মূল্য একটি মশার ডানার সমানও নয়। তারা আমলের সাথে বস্তুর তুলনা করে দুনিয়ার সম্পদকেই গ্রহণ করে; বর্জন করে নেক আমলসমূহকে। কারণ, নেক আমলের সফলতা দৃষ্টির অন্তরালে। দৃষ্টিতে পড়ে আছে মশার ডানার সমান দুনিয়া। আর সে এই দুনিয়াকেই মহাকিছু ভেবে বসে আছে। যেমন সেই বেকুব সরিষার দানাকে হিমালয়ের চাইতে বড় মনে করেছিল।

মূলত সরিষার দানা চোখে পড়ার কারণে সে হিমালয় দেখতে পাচ্ছে না। তাই তাকে বলা হবে, হিমালয়ই বড়, সরিষার দানা নয়। তোমার চোখে

সরিষা পড়ে আছে, তোমার দৃষ্টির ক্ষুদ্রতা ও অপরিসরতার কারণে তুমি পাহাড় দেখকে পাচ্ছ না। সুতরাং এটা তোমার চোখের সংকীর্ণতা, পাহাড়ের সাথে সরিষার কোন তুলনাই নেই।

বুঝের পার্থক্য

এটা আপনার বুঝের দুর্বলতা। এই দুনিয়া বড় নয়। দুনিয়াতো মশার ডানার সমানও নয়। একথা মৃত্যুর সময় ফেরাউনেরও বুঝে এসেছিল। আবু জাহিলেরও বুঝে এসেছিল। কিন্তু তখন বুঝে আসাটা অনর্থক। তখন যদি সে মানে তাহলে নিজের দৃষ্টিকে মানা হবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মানা হবে না। দুনিয়াতে চোখে যে সব পর্দা আছে কিয়ামতের দিন কিছুই থাকবে না। ইরশাদ হচ্ছে,

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَائَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ - (پاره/٢٦)

'তোমার দৃষ্টি থেকে পর্দা হটিয়ে দিলাম আর তা প্রখরভাবে দেখতে লাগল।' দেখতে লাগল জান্নাত, জাহান্নাম ও নেক আমলের প্রতিদানসমূহ।

বিরল সাহায্য

মুহতারাম বন্ধুরা!

ভালো আমলের মধ্যে আল্লাহর সাহায্য আসার মহিমা নিহিত রয়েছে। মন্দ আমলের মধ্যেও লুকায়িত রয়েছে ধ্বংসের সমূহ কারণ। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার মধ্যেও সৎলোকদেরকে বিস্ময়করভাবে সাহায্য করে থাকেন। আল্লাহর সাহায্য দেখে তার মূল্য দেয়া চাই। যদি মূল্য না দেয়া হয় তার উপর আবার বিপদ আপতিত হয়। যেমন হযরত মূসা (আঃ)-এর দু'আয় আল্লাহ তায়ালা আসমান থেকে আযাব নাযিল করেন। আকাশ থেকে অবতীর্ণ সেই নেয়ামতের যথার্থ কদর করেনি তাঁর অনুসারীরা। পরিণামে বিপদের সম্মুখীন হয়েছে তারা। সুতরাং বিরল ও বিস্ময়করভাবে যে সাহায্য ও নেয়ামত আসে তার খুব কদর হওয়া প্রয়োজন। আর সে কদর ও মূল্যায়ন হলো, আল্লাহর শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা করা ঃ তাঁর নির্দেশ মাফিক জীবন যাপন করা। এক লোকের বাড়ি দিল্লীতে। সে নিয়মিতই লাল কেল্লা, কুতুব মিনার, চাঁদনীচকের সামনে দিয়ে যায়। এসব ঐতিহাসিক স্থানগুলো হর-হামেশাই প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু যে ব্যক্তির বাড়ি দিল্লী নয় সে অন্য কোথাও থেকে দিল্লী এসেছে দেখতে। সে যখন দিল্লী

দেখে চলে যাবে তখন সব সময় দিল্লীর আলোচনায় মুখর থাকবে। সর্বদাই বলে বেড়াবে চাঁদনীচক এমন, কুতুব মিনার এমন, লাল কেল্লা দেখতে অনিন্দ্য, আরও কত কি! অনুরূপ যারা দ্বীনের কাজ করতে করতে স্থায়ী বাসিন্দা ও বাড়িওয়ালার মত হয়ে যায় আল্লাহর বিভিন্ন সাহায্য তাদের সাথে লেগেই থাকে। কিন্তু এতে তারা বিস্ময়বোধ করে না, তারা মনে করে এটাতো আল্লাহর অঙ্গীকার। এটাতো এমনই হওয়ার কথা ছিল। যা হয়েছে আল্লাহর ইচ্ছায়-ই হয়েছে। এতে তাদের অহংকারও হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তির প্রতি হঠাৎ করে কোন সাহায্য হয়, সে যখন সাহায্যের কোন ঝলক দেখতে পায় সে খুব তাজ্জব হয়। বহিরাগত দিল্লী দর্শনার্থীর মত।

যারা সর্বদা দ্বীনের সাথে জুড়ে থাকে তারা মনে করে আল্লাহর সাহায্য আমার কথাতো

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ও حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ

এর মধ্যেই বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে নামায পড় সফলকাম হবে। সুতরাং সফলকাম হওয়াটা আল্লাহর পক্ষ থেকে কৃত সিদ্ধান্ত। আমরা আল্লাহর দরবারে ঋণ পরিশোধের জন্যে দু'আ করেছি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছেন।

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَنْ مَّنْ سِوَاكَ -

'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হালাল রুজির মাধ্যমে হারাম থেকে বাঁচাও! তুমি অনুগ্রহ করে আমাকে তুমি ভিন্ন সকল সত্তা থেকে মুখাপেক্ষীহীন করে দাও! যে ব্যক্তি এই দু'আ পাঠ করবে তার ঋণ পরিশোধ হবে। আমি এই দু'আ পাঠ করেছি, আল্লাহ তায়ালা আমার ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছেন। আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ) যা বলেছেন তাই হয়েছে।

সার কথা, দ্বীনের কাজ করতে করতে যারা স্থায়ী বাসিন্দার মত হয়ে যায় তাদের প্রতি প্রতিনিয়ত সাহায্য হতে থাকে। আশা করা যায়, আল্লাহ হয়ত তাকে অহংকার পোশাকীপনা ইত্যাকার মন্দগুণ থেকে হেফাযত করেন।

আমি বুযুর্গ হয়ে গেছি

হঠাৎ কখনো আল্লাহর সাহায্যের এক ঝলক নজরে পড়তেই নিয়মিত এর চর্চা করতে থাকা। যে কোন বৈঠকে বলতে থাকা, অমুক জায়গায় আমাতে

গিয়েছিলাম আর এই ঘটেছে। আমি এত বড় কাজ ছেড়ে জামাতে চলে গিয়েছিলাম আর এভাবে কাজ নিষ্পন্ন হয়ে গেছে। গর্ব করে সবখানেই এই কাহিনী বর্ণনা করছে। এভাবে মানুষের ভেতর বড়ত্ব আসার আশংকা দেখা দেয়। কিন্তু যিনি দ্বীনি কাজে অভ্যস্ত, তিনি এই জাতীয় অবস্থার শিকার হন না। আকস্মিকভাবে যার প্রতি সাহায্য আসে সেই এই ধরনের আত্মগর্বে হারিয়ে যায় আর ভাবে 'আমি বুযুর্গ হয়ে গেছি।' আমি আল্লাহর দরবারে ঋণ পরিশোধের জন্যে দু'আ করেছি, আমার দু'আ কবুল হয়েছে। আমি এখন বুযুর্গ। মুখে যদিও বলেনা 'আমি বুযুর্গ।' কিন্তু মনে মনে একথাই ভাবে– 'আমি কিছু একটা হয়েছি।'

বস্তুর ক্ষমতা– মানুষের অভিজ্ঞতা আমলের ক্ষমতা– আল্লাহর ওয়াদা

কিন্তু আপনি হয়ত দেখেননি, কোন লোক মুখে মধু দেয়ার পর মিষ্টি লাগল আর সে বলে ওঠল 'আমি বুযুর্গ হয়ে গেছি।' এটা কিভাবে? কারণ মুখে মধু যেতেই আমার মুখ মধুময় হয়ে ওঠেছে। আর আমি যখন বরফের কাছে যাই তখন বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে। আগুনের কাছে গেলেও বেশ গরম অনুভব করি। সুগন্ধির দোকানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সুবাস অনুভব করি। সত্যিই আমি বুযুর্গ হয়ে গিয়েছি।

আরে আল্লাহ'র বান্দা!

সুবাস পেয়েছ আর আগুনের তাপ লেগেছে– তা তুমি বুযুর্গ হলে কি করে? তাছাড়া এমন কথা কেউ বলেও না। কিন্তু নামায পড়ার কারণে যদি কোন কাজ সম্পন্ন হয়ে যায় তাহলে সেখানে বলা হয় 'আমি বুযুর্গ হয়ে গেছি।' বস্তুর মধ্যে যে ক্ষমতা আছে এটা মানুষের অভিজ্ঞতা, আর আমলের মধ্যে যে ক্ষমতা আছে সেটা আল্লাহর ওয়াদা। আল্লাহর ওয়াদা যদি পূর্ণ হয় তাহলে মানুষ মনে করতে থাকে 'আমি বুযুর্গ হয়ে গেছি।' আর যখন মনের মধ্যে এই ধারণার উদয় হয় তখনই পতন শুরু হয় মানুষের ! ইরশাদ হচ্ছে,

لَاتُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۔(پاره/ ٢٦)

'তোমরা নিজেদেরকে বুযুর্গ মনে করো না।' নিজেকে নিজে পবিত্র মনে করো না। এ বিষয়ে আল্লাহই ভালো জানেন।

هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى

'আল্লাহই জানেন, কে মুত্তাকী।'

দুর্বলতাও অক্ষমতার সন্ধান

সম্মানিত বন্ধুগণ!

আপনারা যখন দ্বীনের কাজ করতে থাকবেন তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষার পর পরীক্ষা আসতে থাকবে। মানুষ যদি সেসব পরীক্ষার ক্ষেত্রে অটল ও অবিচল থাকে, কাজে নিমগ্ন থাকে তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসবে। তারপর আবার পরীক্ষা আসবে। আবার সাহায্যও আসবে। এভাবে পরীক্ষা দিতে দিতে মানুষ স্থায়ী বাসিন্দার মত হয়ে যায়।

স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যাওয়ার পর তখন যদি আমলের দ্বারা কার্য সম্পাদন না হয় তখন সে সঙ্গে সঙ্গেই চিন্তা করবে 'আমার আমলে দুর্বলতা এলো কোত্থেকে? সে এই সন্দেহ করবে না, আমিতো অমুক আমল করলাম, কিন্তু তার ফায়দা পেলাম না। আমি দু'আ করলাম কিন্তু আমার কাজ হল না। আমি নামায পড়লাম, সফলকাম হলাম না। ঋণ পরিশোধের জন্যে মুনাজাত করছি অথচ ঋণ পরিশোধ হচ্ছে না। এ ধরনের কথা সে ভাববে না; বলবে না।
বরং সে বলবে, আমি আমল করছি কিন্তু তার ফল দেখছিনা। মনে হচ্ছে আমার আমলের মধ্যে দুর্বলতা আছে। সে দুর্বলতার সন্ধান করবে। দুর্বলতার অনুসন্ধান করতে করতে যদি মানুষ ক্ষমা প্রার্থনা ও ইস্‌তিগফার করতে পারে, সত্যি বলছি–মানুষ যদি তাওবাকারী ইস্‌তিগফারকারী হতে পারে তাহলে তাওবা আর ইস্‌তিগফারই তার সবকিছু পরিচ্ছন্ন করে দিবে।

ভাইয়েরা আমার!
নিজের দুর্বলতা অনুসন্ধান করতে থাকুন। দুর্বলতা দূর করতে থাকুন! আল্লাহর দরবারে খুব চাইতে থাকুন! মানুষ যখন তাওবা করে, খুব কান্নাকাটি করে তখন এই কান্নাকাটির পানিতে তার সকল দুর্বলতা বিধৌত করে আল্লাহ তায়ালা তাকে অনেক উঁচু মর্যাদায় সমাসীন করেন।

আল্লাহর পছন্দনীয় বান্দা

যে পাপী বান্দা নিজের অপরাধের কারণে লজ্জিত হয়ে আল্লাহর সামনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে, তাওবা করে, ক্ষমা চায়, আল্লাহ তাকে খুব ভালবাসেন।

যে ব্যক্তি দ্বীনের কাজ করে অহংকার করে তার চাইতে এই ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে বেশী প্রিয়।

এক ব্যক্তি দ্বীনের কাজ করছে। কিন্তু এই নিয়ে সে গর্বিত ও অহংকারে নিমজ্জিত। আল্লাহর দরবারে এর কোন দাম নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি পাপী, কিন্তু পাপের কারণে সে লজ্জিত, সে আল্লাহর দরবারে এই কারণে কাঁদে, এই কাঁদা আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য।

দাওয়াতের পরিবেশ কেন?

বারবার আল্লাহর স্মরণ, আল্লাহর নাম উচ্চারণ, শ্রবণ, গায়বের প্রতি বিশ্বাস সৃষ্টি অদৃশ্যের প্রতি আন্তরিক একীন সৃষ্টি করার লক্ষ্যেই দাওয়াতের পরিবেশ প্রয়োজন। এই সোয়া পাঁচ ফুট শরীর যদি কুরআন-হাদীস মত ব্যবহার হয় তাহলে এর মধ্যে আল্লাহর সাহায্য লুকায়িত আছে। আবার কুরআন-হাদীসের বিপরীত ব্যবহার হলে এর মধ্যেই আল্লাহর পাকড়াও নিহিত আছে। শাস্তি ও পুরস্কার উভয়টাই লুকায়িত আছে। প্রকাশ পাবে মৃত্যুর সময়। দুনিয়াতেও মাঝে মধ্যে প্রকাশ পায়। তবে মৃত্যুর সময় সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়।

দিয়াশলাইয়ের তেলেসমাত

আমি এ সম্পর্কে একটি উপমা দিচ্ছি! একটি দিয়াশলাই। এর ভেতর বিরিয়ানীর অসংখ্য ডেগ লুকায়িত আছে। দিয়াশলাই জ্বালানো হলো। লাকড়ীতে আগুন ধরানো হলো। তারপর তার উপর ডেগ বসিয়ে লাকড়ীর পর লাকড়ী ধরানো হলো। হাজার হাজার ডেগ বিরানী পাকানো হয়ে গেল। ঠিকমত ব্যবহারের কারণে একটি দিয়াশলাই থেকে পাঁচ হাজার ডেগ বিরিয়ানী তৈরী হলো।

আবার এই দিয়াশলাইয়ের মধ্যে জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গও লুকায়িত আছে। পঞ্চাশ লক্ষ গ্যালন পেট্রোলের ট্যাংকিতে ষোল বছরের এক ছেলে একটি দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে ফেলে দিল। তারপর সেখান থেকে একটি লাকড়ী ধরিয়ে প্লাস্টিকের দোকানে ফেলে দিল। সেখানেও দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠল অগ্নিশিখা। অতঃপর আরেকটি লাকড়ী ধরিয়ে তুলার গুদামে ফেলে দিল। চতুর্দিক জ্বলে ওঠলো জ্বলন্ত অগ্নিশিখায়।

সুতরাং বুঝা গেল, দিয়াশলাইয়ের মধ্যে ভয়ানক তান্ডবী অগ্নিশিখাও আছে আবার হাজার হাজার ডেগ বিরিয়ানীও আছে। মানুষের ব্যবহারের উপর ভিত্তি করেই তার ফলাফল প্রকাশিত হয়।

গায়বী সাহায্য ও ধর-পাকড়ের ভিত্তি

আমাদের এই শরীরটিও দিয়াশলাইয়ের মতই। এই শরীরের যথাযথ ব্যবহার হলে আল্লাহর সাহায্য আসবে, ভুলপথে ব্যবহার হলে আল্লাহর আযাব ও গযব আসবে। তবে আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্য ও আযাবের প্রকৃত সময় হলো মৃত্যুর মুহূর্ত। অবশ্য কোন কোন সময় এর ব্যতিক্রমও ঘটে। দুনিয়াতেও আযাব কিংবা সাহায্যের সাক্ষাৎ মিলে।

অন্যান্য যুগে যেমন নবীদের অনুসারী ছিল। তাদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। শক্তি ও সম্পদ ছিল অপ্রতুল। কিন্তু তারা তাদের শরীরকে নবীদের নির্দেশিত পথে ব্যবহার করেছে। বিনিময়ে তারা আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে অবশ্য কিছুই নজরে পড়ে না। তাই অন্যেরা হাসে। উপহাস করে। আজকের লোকেরাও বলে, 'তোমরা বল আল্লাহ অনেক বড়; তোমরা বল আল্লাহ অসীম শক্তিধর; তোমরা পূর্বযুগের কাহিনী শোনাও! তোমরা নূহ (আঃ)-এর যুগে আল্লাহর সাহায্য আসার ঘটনা বল। আর কত কি বল! কিন্তু তোমাদের প্রতি সাহায্য আসছে না কেন ? তোমরাতো খুব অস্থির! তোমরা তাড়িত হচ্ছ; নির্যাতিত হচ্ছ। মার খাচ্ছ তোমরা। তোমাদের দোকান-পাটে অগ্নি সংযোগ হচ্ছে। তোমাদের লোকদেরকে কতল করা হচ্ছে। আর তোমরা বলে বেড়াচ্ছ 'আল্লাহ বড়, আল্লাহ অনেক বড়।'

'আল্লাহ সবচে' বড়

বেচারারা আল্লাহ'র ধ্বনি উচ্চকিত করে যাচ্ছে। আযানে ঘোষণা হচ্ছে 'আল্লাহু আকবার' আল্লাহ সবার বড়। ইকামতে নামাযে ধ্বনিত হচ্ছে একই সুর। নামাযের পরতে পরতে আল্লাহু আকবার। রূকুতে আল্লাহু আকবার। সেজদায় আল্লাহু আকবার। দাঁড়াতে আল্লাহু আকবার। বাচ্চা প্রসবিত হতেই তার কর্ণকুহরে নিনাদিত হচ্ছে 'আল্লাহু আকবার।' জানাযার নামাযেও সেই একই তাকবীর আল্লাহু আকবার– আল্লাহ সবচে' বড়। তোমাদের জীবনের সর্বত্রই আল্লাহু আকবার–আল্লাহ সবচে' বড়। আল্লাহকে তোমরা বড় বলে অহর্নিশ ঘোষণা করে যাচ্ছ। অথচ তোমরাই এতটা পেরেশান যে, অন্যেরা এসে তোমাদেরকে মারছে, তোমাদের সম্পদ লুট করছে, আঘাত করছে, হানা দিচ্ছে, উপহাস করছে, গাল পাড়ছে। আর তোমার জিগির গেয়ে যাচ্ছো, 'আল্লাহ সবার বড়-আল্লাহ সবার বড়।'

আল্লাহর খাযানা অসীম

তোমরা বল আল্লাহ এত বড়, তিনি আকাশ সৃষ্টি করেছেন, মাটি সৃষ্টি করেছেন, চাঁদ সৃষ্টি করেছেন, সূর্য সৃষ্টি করেছেন, বীর্যের বিন্দু কণিকা থেকে কত বড় মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তোমরা বল আল্লাহর খাযানা অসীম। তিনি কত কি তৈরি করেছেন।

যত মানুষ তৈরি করেছেন সকলকেই দিয়েছেন স্বতন্ত্র রূপ, স্বতন্ত্র অবয়াব। সকলের সুর ভিন্ন, আকৃতি আলাদা। তাঁর খাযানায় আকৃতি বেশুমার, আওয়াজ ও সুর বেশুমার।

প্রতিদিন তিন লক্ষাধিক সন্তান ভূমিষ্ট হয়। প্রত্যেকেই নতুন আকৃতি, নতুন সুর নিয়ে পৃথিবীতে আসছে। আল্লাহর ভান্ডার থেকে প্রতিদিন তিন লক্ষ শিশু ছয় লক্ষ চক্ষু নিয়ে আগমন করছে। অথচ আল্লাহর ভান্ডারে চোখের কোন অভাব পড়ছে না।

তোমাদের আল্লাহ তোমাদেরকে কেন সাহায্য করছেন না

তোমরা যখন অবিরাম বলে যাচ্ছ—আল্লাহ এতবড়, আল্লাহ অসীম শক্তিধর, তাঁর শক্তি এত নিঃসীম, তিনি খুঁটি ছাড়াই কত বিশাল আকাশ তৈরি করেছেন। এই আল্লাহর যে বিরল সাহায্য ও বিস্ময়কর নুসরতের কথা তোমরা বলে বেড়াও; তোমরা বলে বেড়াও আল্লাহর সাহায্যের কত কাহিনী। আল্লাহর সাহায্যে আগুন ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল, ছুরিকে ভোঁতা করে দিয়েছিল, কখনো বা মাছের পেটে নিরাপদে সংরক্ষণ করেছিল কাউকে, আল্লাহর সাহায্য কাউকে জেলখানা থেকে তুলে এনে মিসরের রাজ্য ভান্ডারের অধিপতি করেছে।

এসব অতীতকালের সাহায্যের কথা তোমরা বল। তাহলে এসব সাহায্য তোমাদের প্রতি কেন আসে না। তোমরা কুরআনের কথাও বল। আল্লাহর প্রসংশাও কর। আল্লাহকে বড়ও বল। কিন্তু আল্লাহর সাহায্য তোমাদেরকে স্পর্শ করে না কেন?

বন্ধুরা আমার!

এগুলো কোন নতুন কথা নয়। এই ধরনের কথা রাসূল (সাঃ)সহ সকল নবীর যুগেই বলা হয়েছে।

মানুষকে আল্লাহর শক্তি সম্পর্কে ভয় দেখাও

রাসূলে করীম (সাঃ) যখন কালিমায়ে তায়্যেবার দাওয়াত দিতে শুরু

করলেন, আল্লাহর বড়ত্ব বর্ণনা করতে শুরু করলেন তখন আল্লাহ তায়ালা

فَكَبِّرْهُ

(আল্লাহ'র বড়ত্ব বর্ণনা কর!) এর সাথে সাথে

قُمْ فَاَنْذِرْ

(ওঠ, মানুষকে ভীতি প্রদর্শন কর!) ও বলেছেন। মানুষকে আল্লাহ তায়ালার শাস্তি ও আযাব সম্পর্কে ভয় দেখাও। বল, তোমরা যদি আল্লাহর কথা না মান, তাহলে আযাবও কিন্তু বরদাশ্‌ত করতে পারবে না।

হ্যাঁ ভাই!

মানুষকে তো একথা বলেই ভয় দেখাতে হবে, আল্লাহ বড়। যদি না মানে তাহলে মনে রেখ, জাহান্নামে যেতে হবে। জাহান্নামে সাপ আছে, বিচ্ছু আছে, হাতকড়া আছে, শিকল আছে। ক্ষুধা-তৃষ্ণার যন্ত্রণা আছে, মার-ধর আছে; আছে অগ্নি, অন্ধকার।

আল্লাহ সম্পর্কে ভয় দেখানোর জন্যে অতীতকালের ঘটনাবলী বর্ণনা করুন। বলুন! দেখ ফেরাউন আল্লাহকে মানেনি। তার পরিণতি কত কঠিন হয়েছিল! ফেরাউনের সম্প্রদায়কে কত শক্তভাবে পাকড়াও করেছিলেন। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর!

আল্লাহকে এক মান

আল্লাহকে এক মান। একাধিক খোদা মেনো না। যদি আল্লাহ ছাড়া কাউকে খোদা মান তাহলে যত ভালো কাজ করবে কিয়ামতের দিন তার কোন প্রতিদান পাবে না। এই জাতীয় কথা তাকে বুঝাতে থাকবে।

মন্দ এবং দুর্বল লোকদের কথা

কিন্তু দুর্বল এবং মন্দ লোকেরা তাদেরকে কেবল কষ্ট দিতে থাকে। কষ্ট দিতে দিতে এক পর্যায়ে একথাও বলে– তোমরা বল, আল্লাহ সবার বড়। আল্লাহ অসীম ক্ষমতার মালিক। অতীত কালের ঘটনাবলীও শোনাও! কিন্তু সে আল্লাহ তোমাদের সাথে তো কোন সাহায্য ও সহযোগিতামূলক আচরণ করছেন না।

বন্ধুরা আমার!

অতীতকালেও মন্দ লোক ছিল। তারাও এ জাতীয় কথা বলত।

নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের দাবী

নূহ (আঃ) -এর জাতি ৯৫০ বছর পর্যন্ত এই বুলিই আওড়িয়েছে। সর্বশেষ বলেছে ঃ

فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ

'তুমি যে শক্তির অঙ্গীকার করছো যদি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে তা অর্থাৎ, তুমি আমাদেরকে আযাবের ধমক দেখাও। আরে, আযাবের জন্যে আবার কেয়ামতের অপেক্ষা কে করবে? তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে আযাব এনে দেখাও!

তারপর আল্লাহ তায়ালা সংবাদ দিলেন, শীঘ্রই বন্যা আসবে। মহা তুফান অত্যাসন্ন! তুমি একটি নৌকা তৈরি কর। আদেশ অনুযায়ী তিনি নৌকা বানাতে লাগলেন। এ দেখে তারা সকলেই উপহাস করতে লাগল! কোথাও পানির নামগন্ধও নেই আর এ নৌকা বানাচ্ছে। তাবলীগের কাজ করতো এখন কাঠের কাজ আরম্ভ করেছে। মুবাল্লিগ থেকে মিস্ত্রি।
ঠাট্টা করছে।
হযরত নূহ (আঃ) বললেন ঃ

قَالَ اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ (پاره/١٢)

'তিনি বললেন; তোমরা যদি আমাদের সাথে উপহাস কর আমরাও তোমাদের মত উপহাস করব।' তারপর আল্লাহর আযাব আপতিত হলো। তখন আর তাদের কিছুই করার ছিল না।

সব জিনিসেরই একটি সময় আছে

রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি কুরআন শরীফ অবতীর্ণ হচ্ছিল আর তিনি পূর্ববর্তী ঘটনাবলী মানুষকে শোনাচ্ছিলেন। আর এই নষ্ট প্রকৃতির লোকেরা তখনও বলছিল,

اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ

'এতো পুরানো লোকদের কাহিনী।'

তারাও বলত, তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে সাহায্য করছেন না কেন? তাঁরা বলতেন ঃ আল্লাহর সাহায্যের একটি নির্ধারিত সময় আছে। তোমাদের প্রতি আযাবও আসবে যথাসময়ে। সেই সময়টির কথা আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বলেননি। তবে এতটুকু বলেছেন,

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ (پاره/٢٧)

'তোমাদের দল পরাজিত হবে। পিঠ ফিরিয়ে পালাবে।' এটা আল্লাহর দেয়া সংবাদ। তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ - اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ - وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُوْنَ - (پاره/٢٣)

'আমার রাসূল বান্দাদের প্রতি আমার কৃত সিদ্ধান্ত হলো, তাঁরাই বিজয়ী হবেন। আমার বাহিনী-ই জয়লাভ করবে।'

আল্লাহর বাহিনী কারা?

যাঁরা আল্লাহকে এক মানে, আল্লাহকে বড় মানে এবং নবীদের তরীকা অনুযায়ী চলে তারাই আল্লাহর বাহিনী। অতীত কালে যারা নবীগণের কথা মেনেছে কিয়ামত পর্যন্ত যারা নবীগণের পন্থা অনুযায়ী জীবন যাপন করবে তারা সকলেই আল্লাহর বাহিনী। আমরা নবীগণের কাজ করব, অভিশপ্ত পথভ্রষ্ট লোকদের পন্থা বর্জন করে চলব। আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে নেয়ামত প্রাপ্তদের পথে চলব। তাহলে যেভাবে নবীদের প্রতি আল্লাহর সাহায্য এসেছিল আমাদের প্রতিও সাহায্য আসবে। আসতে থাকবে প্রতিনিয়ম।

তিনটি কাজ করতে হবে

তিনটি কাজ আমাদেরকে সর্বদা করতে হবে।

এক অভিশপ্ত পথভ্রষ্টদের দল থেকে বেরিয়ে আসা নিয়ামত প্রাপ্তদের দলভুক্ত হয়ে যাওয়া। নবী বিন্যাস ও তরতীব মত তিনটি কাজ এভাবে করতে হবে–

১. দ্বীন শিখতে হবে। ২. দ্বীনের উপর চলতে হবে। ৩. দ্বীনের জন্যে চেষ্টা করতে হবে। যে ব্যক্তি দ্বীন শিখে নাই সে ব্যক্তির ব্যাপারে আশংকা আছে, সে যে কোন সময় গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে পারে।

কেউ কেউ এমনও আছে, দ্বীন শিখেছে। কিন্তু দ্বীনের উপর আমল নেই। ইলম্ আছে আমল নেই। তার ব্যাপারেও ভয় আছে, সে অভিশপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারে।

বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ি থেকে বাঁচ

খ্রিস্টানদের মধ্যে ছিল বাড়াবাড়ি। আর ইহুদীদের মধ্যে ছিল ছাড়াছাড়ি। খ্রিস্টানরা ঈসা (আঃ)-এর মর্যাদা বাড়াতে বাড়াতে তাঁকে খোদা বানিয়ে ফেলেছে। আর ইহুদীরা ঈসা (আঃ) কে অমর্যাদা করতে করতে অবৈধ সন্তান পর্যন্ত বলেছে।

অথচ ঈসা (আঃ) আল্লাহও নন। আল্লাহর পুত্রও নন, তিনি একজন আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও রাসূল। তাঁর প্রতি কোনরূপ অবমাননা বৈধ নয়।

মুহতারাম বন্ধুগণ! জেনে না করা অভিশপ্তদের পথ আর না জেনে করতে থাকলে পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে প্রবল।

সিরাতে মুসতাকীম

আরেক ব্যক্তি হলো এমন যে দ্বীন শিখে এবং দ্বীনের উপর চলে। তাহলে আল্লাহ তায়ালার দরবারে আশা করা যায়, সে হয়ত পথভ্রষ্ট ও অভিশপ্ত উভয় দল থেকে মুক্তি পাবে। এখন তাকে নেয়ামতপ্রাপ্তদের দলে আসতে হবে। আমরা দু'আ করি–

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

'হে আল্লাহ! আমাদেরকে সরলপথে পরিচালিত কর।'

اِهْدِنَا –

এর তরজমা করব? এর অর্থ হলো, বল, চালাও এবং পৌঁছে দাও। 'এ হলো জামে মসজিদের পথ।' এটা হলো 'বল' 'চল' আমিও তোমার সাথে যাচ্ছি, এটা হলো 'চালাও।' সাথে চলে মনযিলে পৌঁছে দেয়া হলো 'পৌঁছাও।'

'মুজাহাদা' হেদায়াতের পথ

আল্লাহ বলেছেন, আমি এটা করব। সরল পথ দেখাব। কিন্তু কাকে? যে ব্যক্তি এ পথে চলতে সচেষ্ট হবে তাকে। মূল কর্তাতো আল্লাহ পাক। তারপরও যতটুকু চেষ্টা বান্দাকে করতে বলা হয়েছে সে যদি ততটুকু চেষ্টা করে তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাকে অবশ্যই পথ দেখাবেন। পথে চালাবেন। আশা আছে, আল্লাহ তাকে অভীষ্ট লক্ষ্যে উত্তীর্ণ করে দিবেন। তবে শর্ত হলো আল্লাহর আদেশ মানতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে–

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

'যারা আমার জন্যে চেষ্টা করবে আমি তাদেরকে আমার পথ চিনিয়ে দেব।' এক হলো দ্বীনের উপলব্ধি আরেক হলো দ্বীনের উপর আমল করা। কেউ যদি দ্বীন শিখে এবং সে অনুযায়ী আমল করে আল্লাহর মেহেরবানীতে সে পথভ্রষ্ট ও অভিশপ্তদের পথ থেকে বেঁচে যাবে– পেয়ে যাবে নেয়ামতপ্রাপ্তদের পথ–সীরাতে মুস্তাকীম।

সকল কাজ নবীর তরীকা অনুযায়ী

এক ব্যক্তি জামাতে জামাতে ঘুরল। নামায শিখল। সিদ্ধান্ত নিল, জীবনের সর্বক্ষেত্রে নবীর তরীকা জেনে সে অনুযায়ী চলব। সন্তান লালন পালনের ক্ষেত্রে নবীর তরীকা কি? তাও জেনে নিল। সন্তান বড় হলে কি করতে হবে-তাও শিখে নিল। সন্তানের বিয়ের সময় কি করতে হবে তাও জেনে নিল; সন্তানের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রশিক্ষণ কিভাবে দিবে তাও বুঝে নিল। অর্থাৎ মানুষের জীবনের যতগুলো স্তর আছে সবগুলোর মধ্যেই আল্লাহর হক এবং রাসূলের তরীকা জেনে নিল।

সুতরাং সে জানেও, সে অনুযায়ী চলেও। আল্লাহর রহমতে এড়িয়ে চলে সে ভ্রান্ত ও অভিশপ্ত পথ।

নবুওয়তের কাজ এখনো অবশিষ্ট

এখন তাকে নিয়ামতপ্রাপ্তদের কাতারে আসতে হবে। এখন তাকে তৃতীয় একটি কাজ করতে হবে। আর সেটা হল দ্বীনের জন্যে চেষ্টা। কারণ, নবীগণের আগমনতো আল্লাহ বন্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু নবীগণের কাজ বন্ধ করেননি। বরং নবীগণের কাজ আরও বিস্তৃতি লাভ করেছে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, গ্রাজুয়েট, ধনী-গরীব, সাদা-কালো সকলকেই একাজ করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা সকলকেই এ দায়িত্ব দিয়েছেন। এখন আমাদেরকে 'নিয়ামতপ্রাপ্ত' কাতারে আসতে হবে। আমরা দু'আ করি হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে সরলপথে পরিচালিত কর। আর সে সরলপথ হলো–

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

'তাঁদের পথ যাঁদের প্রতি তুমি নিয়ামত দান করেছ। আমাদেরকেও তাদের পথেই পরিচালিত কর।

পুরস্কার প্রাপ্ত দল

পুরস্কার প্রাপ্ত কারা সেটাও আল্লাহ তায়ালা বলে দিয়েছেন–

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ - (پاره/٥)

আল্লাহ তায়ালা চার শ্রেণীর লোকের প্রতি পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহীনের জামাত।

নবীগণ সব রকমের সাধনার মাধ্যমে দাওয়াতের কাজ করেছেন, সিদ্দীক নবী নন। কিন্তু তিনি হুবহু নবীর তরতীবে কাজ করেন। সিদ্দীকগণও দ্বীনের জন্যে কাজ করেছেন। যার পর নাই চেষ্টা করেছেন। আর শহীদগণতো দ্বীনের জন্যে জীবনই দিয়ে দিয়েছেন। সালেহীন হলেন সৎকর্মশীল বান্দা। তাঁদের সর্বোচ্চ স্তর হলো, নিজে দ্বীনের উপর চলা অন্যকেও দ্বীনের উপর চালাতে চেষ্টা করা। ইরশাদ হচ্ছে–

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِيْنَ - (پاره/٧)

'হযরত যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা ও ইলিয়াস (আঃ) সকলেই ছিলেন সালেহীন-সৎকর্মশীল।'

জান-মাল ঃ নববী তারতীব

ভায়েরা আমার!

একতো হলো দ্বীন শিখা। দ্বিতীয়ত, দ্বীনের উপর চলা। তৃতীয়ত, দ্বীনের জন্যে মেহনত করা। আর এটা কোন কঠিন কাজ নয়।

আমাদের এই সাড়ে পাঁচ ফুট শরীর, আমাদের এই হায়াত, এই অর্থ কড়ি–যতটুকু আল্লাহ দান করেছেন–এটাকে নবী (সাঃ)-এর তারতীব ও বিন্যাসে নিয়ে আসাটাই মূল কাজ।

যার কাছে দুই হাজার টাকা সে ওটাকেই তারতীব দিবে, পনের কোটি থাকলে সেটাকেও তারতীব দিবে। বাকী আমাদের হায়াত! ত্রিশ বছর হোক আশি বছর হোক। হায়াতের ব্যাপারে কারোরই জানা নেই কবে নাগাদ পূর্ণ হবে। তাই আমাদের বয়স যাই হোক সেটাকেই নববী তারতীবে নিয়ে আসা উচিত।

সম্পদ যতটুকু আছে ওটাকেই নববী তরতীবে নিয়া আসা, যতটুকু হায়াত আল্লাহ দিয়েছেন ওটাকেই নববী তরতীবে বিন্যাস করা আমাদের কর্তব্য। আল্লাহ তায়ালা এটা দেখেন না কে কতটুকু অর্থ ব্যয় করল; কতটুকু জান দিল। তিনি দেখেন কতটুকু থেকে কতটুকু লাগল। এই হিসাবেই আল্লাহ তায়ালা আচরণ করেন।

এক ব্যক্তির কাছে পাঁচশ' টাকা আছে। সে পাঁচশ' নিয়েই চার মাসের জন্যে পায়দল জামাতে বেরিয়ে পড়েছে। অন্য আরেকজন লাখপতি, কোটি পতি। সে পয়ত্রিশ হাজার নিয়ে এসে অষ্ট্রেলিয়ার জামাতে যাবে।

এখন সকলের দৃষ্টিই যাবে পয়ত্রিশ হাজারের দিকে। পাঁচশ' টাকাওয়ালার দিকে কারোই নজর যাবে না। কিন্তু আল্লাহ কিভাবে দেখবেন?

আল্লাহ তায়ালার দরবারে পাঁচশ টাকাওয়ালা পূর্ণ সম্পদ খরচকারীদের দলভুক্ত হবে। আর পয়ত্রিশ হাজারওয়ালাতো তার সম্পদের হয়ত হাজার ভাগের একভাগ করেছে। একজনের কাছে চার লক্ষ আছে, আরেক জনের কাছে আছে এক লক্ষ। প্রথম জন চার লক্ষ থেকে এক লক্ষ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করল আর দ্বিতীয় জন পূর্ণ একলক্ষই আল্লাহর পথে লাগিয়ে দিল। তাই এই এক লক্ষওয়ালা প্রথম জনের তুলনায় চারগুণ বড় জান্নাত পাবেন। কারণ সে পূর্ণ অর্থটাই লাগিয়ে দিয়েছে

সিদ্দীকের জন্যে আল্লাহ ও রাসূলই যথেষ্ট

তাবুক যুদ্ধের সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর সকল সম্পদ এনে নবীজীর দরবারে হাজির করলেন। একটি ছোট্ট পুঁটলীতে বেঁধে। হযরত উমর (রাঃ) আনলেন স্বীয় সম্পদের অর্ধেক। সেও একটি বড় গাঠুরী। উমর মনে মনে ভাবলেন, আজ আমি পুণ্যলাভে আবু বকরকে ছাড়িয়ে যাব।

আবু বকর তাঁর ছোট্ট পুঁটুলীটা পেশ করলেন। উমর পেশ করলেন বিরাট বড় পেটি। রাসূল (সাঃ) একথা জিজ্ঞেস করেননি, তোমরা কে কতটুকু পরিমাণ এনেছ? কারণ, পরিমাণতো সামনেই। উমরকে জিজ্ঞেস করেছেন, ঘরে কতটুকু রেখে এসেছ? উমর বলেছেন, যতটুকু এনেছি ততটুকুই রেখে এসেছি। অর্ধেক এনেছি অর্ধেক রেখে এসেছি।

আবু বকরকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কতটুকু রেখে এসেছ? তিনি বললেনঃ আমি আল্লাহ ও রাসূলের নাম রেখে এসেছি। আবু বকরের ছোট্ট পুঁটুলীর মর্যাদা অনেকগুণে বেড়ে গেল। কারণ, এটা পূর্ণ সম্পদ।

সকলের জন্যেই সুযোগ আছে

এখন আমাদের ধনী শ্রেণীর বন্ধুরা বললেন, দেখ, এই মৌলভী সাহেব গরীবদের কি প্রচন্ড পক্ষপাতিত্ব করছে। তারা পাঁচশ' টাকা খরচ করলেও কত সওয়াব আর আমরা পঁচিশ হাজার খরচ করলেও কম সওয়াব।

কিন্তু ভাই!

জান লাগানোর ক্ষেত্রে ধনীরা গরীবদের চাইতে বেশি প্রতিদান পাবে। কারণ, গরীব বেচারা পঁচিশ মাইল যদি পদব্রজে যায় তাহলে এটাও তার একটি অভ্যাসের বিষয়। কিন্তু ধনী বেচারা ঃ সেতো কলিং বেলে টিপ দিতেই খেদমতে এসে হাজির হয় দশ দশজন। সে কখনো থলেও হাতে নেয়নি। সেই যখন আল্লাহর রাস্তায় বেরুবে। সংক্ষিপ্ত সামান শত সঙ্গে করে এক মসজিদ থেকে অন্য মসজিদে যাবে। তাহলে আশা করা যায় সে গরীব বেচারার পঁচিশ মাইল পায়ে হাঁটার চেয়ে বেশী সওয়াব পাবে।

এই সেই লোক যারা, তারা পরকালীন জান লাগানোর কারণে অধিক সওয়াব পাবে আর সম্পদ খরচ করার বেশী সওয়াব পাবে গরীব লোকেরা। কারণ, তাদের সম্পদ সামান্য। এখান থেকেই তারা আল্লাহর পথে খরচ করে।

তিনটি জিনিস

মুহ্তারাম বন্ধুগণ!

এক হলো দ্বীন জানা, আরেক হলো দ্বীনের উপর চলা, আরেক হলো দ্বীনের জন্যে কোশেশ করা। এই তিনটি বিষয় যদি হাসিল হয়ে যায় তাহলে আশা করা যায়, আল্লাহ আমাদেরকে নিয়ামতপ্রাপ্তদের মধ্যে শামিল করে নিবেন।

আমি পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আল্লাহর সাহায্য লুকায়িত আছে। আর যারা বক্র পথের যাত্রী তাদের জন্যে পেরেশানী এবং শাস্তিও লুকায়িত আছে। যথাসময়ে প্রকাশিত হবে।

আর তারা উপহাসও করবে। তের বছর পর্যন্ত উপহাস করেছে। কিন্তু দ্বীনের কথা পরিবর্তন হয় নাই।

মসজিদ এবং বাজারের আওয়াজ এক নয়

ভাই!

মসজিদ পন্থীদের কথার পরিবর্তন হয় না। বদরের খুব মুজাহাদা হয়েছিল।

কিন্তু আল্লাহর বড়ত্বের শ্লোগান নিয়তই উচ্চারিত হয়েছে। তারপর সাহায্য এসেছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব। আপনারা নিশ্চয় আসরের পরের বয়ান শুনেছেন।

এক বৃদ্ধ বলছে, আমরা বেঁচে আছি আমাদের কৌশলের দ্বারা। যুবক বলছে, আমরা বেঁচে আছি পরিশ্রমের দ্বারা। কিন্তু আল্লাহ্ বলেন, কৌশল পরিশ্রম কোনটিই তোমাদেরকে বাঁচায় না। বাঁচিয়ে রাখে আমার সাহায্য। আর এই সম্পদ আমার। যেখানে বলব, সেখানেই কাজে লাগবে।

মুহতারাম!

সাহায্য আসলেও আল্লাহু আকবার! মুজাহাদা আসলেও আল্লাহু আকবার। সম্পদের মুজাহাদার সময়ও আল্লাহ আকবার। আল্লাহু সর্বত্রই বড়। শত কষ্টের মধ্যেও আল্লাহ বড়। এটা মসজিদপন্থী শ্লোগান। এর কোন পরিবর্তন নেই। কিন্তু বাজারের শ্লোগান রীতিমতই পরিবর্তন হয়।

ক্রেতা দোকানীকে বলে, পয়সা নাও সদাই দাও। আমার পয়সা দ্বারা আমার কাজ হয়। আমার প্রয়োজন পূরণ হয় তোমার সদাই দ্বারা। সুতরাং পয়সা নাও! সদাই নাও!

দোকানীর আওয়াজ কি? সে বলে, সদাই দিয়ে আমার কাজ হবে না। আমার চাই অর্থ। সুতরাং পয়সা দাও! সদাই নাও!

দোকানীর শ্লোগান এক। ক্রেতার আওয়াজ আরেক। সন্ধ্যা পর্যন্ত এই ধ্বনিই প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। এখন ছোট দোকানীর সব মাল বিক্রি হয়ে গেল। টাকাও হাতে এসে পড়ল। সে এখন পয়সা নিয়ে বড়দোকানীর সামনে হাজির। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার শ্লোগান ছিল, সদাই নাও পয়সা দাও! সন্ধ্যা বেলা সে বড় দোকানীর সামনে গিয়ে এখন আওয়াজ বদলে গেছে। এখন সে বলছে, আমার কাছে পয়সা তো আছে, ও দিয়ে আমার কাজ হচ্ছে না। তোমার কাছে যে সদাই আছে আমাকে সেই সদাই দাও! আমার পয়সা নিয়ে নাও! সকালের আওয়াজ একটি। বিকালের আওয়াজ আরেকটি। ক্রেতার আওয়াজ একটি, দোকানীর আওয়াজ আরেকটি।

এক কথায় এই বাজারীলোক, রাজত্ব ও সম্পদের অধিকারী, টাকা-পয়সার মালিক, স্বর্ণ-রূপা, ক্ষেত-খামার ও ডিগ্রিধারীদের আওয়াজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। তাদের কথা রূপান্তরিত হয়। কিন্তু মসজিদওয়ালার

আওয়াজ 'আল্লাহু আকবার' এর পরিবর্তন নেই।

পেরেশানী-অস্থিরতা সর্বাবস্থায় মুখে মুখে উচ্চারিত হয়েছে 'আল্লাহু আকবার'।

পালনকর্তা আল্লাহ

মুহ্তারাম বন্ধুরা!

সিরাতে মুস্তাকীমের উপর চলার জন্যে মানসিকতার পরিবর্তন জরুরী।

মানসিকতা কি?

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

'সমগ্র জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যে সমস্ত প্রশংসা।' তিনিই সকল প্রয়োজন পূরণ করেন।

রূহের জগতে তো সকলেই বলেছিল, হে আল্লাহ! তুমিই আমাদের প্রতিপালক। কিয়ামতের দিনে আবার সমস্ত কাফের মুশরিক এককণ্ঠে ঘোষণা করবে 'আল্লাহ! তুমিই আমাদের প্রতিপালক।' বুঝা গেল, আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক এ সম্পর্কে পেছনের লাইন সম্পূর্ণ পরিষ্কার। সামনের পথও পরিষ্কার।

এখন মাঝখানের পথ হলো দুনিয়া। এই পথ যদি পরিষ্কার হয়ে যায়, পেছনের পরিচ্ছন্ন লাইনের সাথে যদি যথাযথভাবে সংযুক্ত হয়ে যায় তাহলেই 'সিরাতে মুসতাকীম' সরল সঠিকপথ হয়ে গেল। সুতরাং এই মাঝখানের পথ ঠিক করাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

এই পৃথিবীতে মানুষ মেনে নিবে 'আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক।' আল্লাহ তায়ালা বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

প্রকৃত কারক ও কর্তা তো হলেন আল্লাহ তায়ালা। কিন্তু সেটা নজরে পড়ে না। নজরে পড়ে ব্যবসা চললে আমার প্রয়োজন পূর্ণ হয়। এটা দেখা যায়। একীনও বিশ্বাস গড়ে ওঠে এরই উপর। ফলে সীরাতে মুসতাকীমের পথ হযবরল হয়ে যায়। যদি কারও মনের মধ্যে একথা প্রতিষ্ঠা পায় যে, আমার প্রয়োজন পূরণ করে পয়সা। পয়সা আসে ব্যবসা থেকে। একথা মনে এলেই বুঝতে হবে আমি সেই সরল পথে নেই। সঠিক পথ থেকে আমি সরে পড়েছি। তাই একথা বার বার আলোচনা করতে হবে।

একটু ভাবুন!

আপনি একটু হোটেলে গিয়ে দশ টাকার খানা খেলেন। কিন্তু আপনি হোটেলে যে ভাত খেলেন- একটু ভাবুন তো, এই ভাত কিভাবে আপনার সামনে এসে হাজির হলো। এক বিশাল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই ভাত আপনার সামনে এসেছে। বৃষ্টি, সূর্য, চাঁদ, তারা, আকাশ, মৃত্তিকাসহ কোটি কোটি মানুষের হাজার হাজার বছর সাধনার পথ ধরে ধান থেকে ভাত হয়ে আপনার উদরে স্থান পেয়েছে।

আপনি ভেবে দেখুন! আপনার তরকারীর মরিচ কোত্থেকে এসেছে? লবণ কোত্থেকে এলো? তৈল কোত্থেকে এলো? যে প্রাণীর গোশ্‌ত আপনি স্বচ্ছন্দে খাচ্ছেন সেও তো হাজার বছরের বংশ পরম্পরায় আপনার খেদমতে পৌঁছেছে। গরু-গাভীর মিলনে বাছুর হয়েছে। বাছুর বড় হয়ে তার থেকে জনম পেয়ে আরও বাছুর। বংশ পরম্পরায় সেই বাছুর থেকে গোশ্‌ত হয়েছে। আপনি সেই গোশ্‌ত এখন হোটেলে বসে খাচ্ছেন। ঝোল খাচ্ছেন। রুটি খাচ্ছেন। অথচ দশ টাকায় এই বিশাল এন্তেজাম কি কখনো সম্ভব হতো?

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সমস্ত প্রয়োজন পূরণ কর্তা সে তো কেবলই আল্লাহ। আমাদের পরিধেয় এই কাপড়, কাপড় তৈরির সূতা, সূতা তৈরির পাট, তুলা এও হাজার বছর পরিশ্রমের ফসল। আমরা যদি এভাবে ভাবতে থাকি তাহলে আমাদের সামনে প্রকৃত সত্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠবে যে প্রকৃত প্রয়োজন পূরণকারী আল্লাহ! দশ টাকায় অনুগ্রহ করেছেন। দশ টাকায় প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করেছেন। প্রকৃত করনেওয়ালা আল্লাহ।

শরীরের একটি অঙ্গের গুরুত্ব

তারপর লক্ষ্য করুন ! আল্লাহ তায়ালা আমাদের কত বড় বড় প্রয়োজন পূরণ করেছেন। চক্ষু দিয়েছেন, কান দিয়েছেন, জিহ্বা দিয়েছেন, হাত দিয়েছেন, পা দিয়েছেন, বিবেক দিয়েছেন, মেধা দিয়েছেন। এগুলো সবই আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয়। এগুলোর মধ্যে একটি অঙ্গও যদি বেকার - অকার্যকর হয়ে যায় তাহলে মানুষ কত অস্থির হয়ে পড়ে। যদি চক্ষু অকেজো হয়ে পড়ে তাহলে আমরা কিছুই দেখতে পাব না। তারপর অপারেশনে ঠিক হলে আমরা একথাই বলি, হে আল্লাহ! তোমার কত বড় মেহেরবানী, তুমি ছয় মাসের মধ্যে আমার দু'টি চোখই ভাল করে দিয়েছ।

অনেক মানুষ সম্পর্কে শুনেছি, বড় বড় ডাক্তার চোখের অপারেশন করে ফেল মেরেছে। কৃতকার্য হয়নি।

অনুরূপভাবে আমাদের কান, জিহ্বা ও কলিজার কার্যকারিতা যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে জীবিত থাকাই মুশকিল! দৈনিক হাজার হাজার টাকা খরচ করার পর ভিন্ন দেশের ডাক্তার এসে হয় তো এমন যন্ত্র সংযোজন করে দিবেন যা কলেজা থেকেই সৃষ্টি হয়। আর সেটাও বেশী দিন টিকে না। অবশেষে মৃত্যুই শেষ পরিণাম হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের হাত-পা কত বড় নেয়ামত। যে ব্যক্তির হাত নেই দেখুন তাকে কত কষ্ট করতে হয়। আল্লাহ তায়ালাই আমাদের এসব প্রয়োজন পূরণ করেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন

আল্লাহ তায়ালা আমাদের এসব প্রয়োজন পূরণ করছেন একান্তই স্বার্থহীন ভাবে। দুনিয়াতে মালিকরা শ্রমিককে পয়সা দেয় কাজের বিনিময়ে। শ্রমিক ও কাজ করার সময় ভাবে এর বিনিময়ে আমাকে পয়সা দেওয়া হবে। বড় দেশ যখন কোন ছোট দেশকে সাহায্য করে তার পেছনেও কোন মতলব নিহীত থাকে। এটাই দুনিয়ার সাধারণ রেওয়াজ। যে কোন কাজের পেছনে অবশ্যই কোন না কোন মতলব থাকে।

আল্লাহ তায়ালা সকলের প্রয়োজনই পূরণ করেন। মানুষের প্রয়োজনও, পশু-পাখির প্রয়োজনও। আমাদেরকে তো দোকান পাট দিয়েছেন কিন্তু জানোয়ার জগতের তো কোন ব্যবসা-বাণিজ্য নেই। অথচ তাদের প্রয়োজন ও আল্লাহ তায়ালা নিয়মিত পূরণ করছেন। আর এই প্রয়োজনগুলো পূরণ করা আল্লাহর একান্তই অনুগ্রহ।

اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

'পরম করুণাময় অসীম মেহেরবান।'

বান্দা আমার! ভুলে যেওনা

'আল-হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীনের' মধ্যে তো বলেছেনঃ সমস্ত প্রয়োজন তো আল্লাহই পূরণ করেন। আল্লাহ তায়ালা বারবার একথা স্মরণ করিয়ে দেন- বান্দা আমার! আমাকে ভুলে যেওনা। কারণ, তুমি যখন

দোকানে যাবে তখনতো তোমার মানসিকতা হয়ে যাবে 'দোকান দ্বারাই আমার কর্ম সম্পাদিত হয় । বস্তুর দ্বারাই কাজ সম্পন্ন হয়।'

আমার প্রিয় বান্দা! লক্ষ্য কর, আমি তোমাকে বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, তুমি রূহের জগতে বলেছিলে– কিয়ামতের দিনও বলবে। সুতরাং আজকেও বল– তোমার আজকের বলাটাই কিন্তু ধর্তব্য ও গ্রহণযোগ্য হবে। শুধু মুখে বললেই হবে না, অন্তর থেকে বলতে হবে। যখন তুমি অন্তর থেকে বলবে তখনই ঈমান সৃষ্টি হবে। তাই তুমি মসজিদের মধ্যে মুখে মুখে বলে ঈমান শিখ। আস্তে আস্তে অন্তরে বসে যাবে। আল- হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন' সমস্ত প্রয়োজন পূরণ করেন আল্লাহ তায়ালা।

আমাদের প্রয়োজন, আমাদের স্ত্রীদের প্রয়োজন, আমাদের বাচ্চাদের প্রয়োজন গায়েব থেকে আল্লাহ তায়ালা পূরণ করেন।

ছোট বাচ্চা। এক দেড় বছর বয়স। তাকেও যখন খাবারের লোকমা মুখে তুলে দেয়া হয় সে মুখ বাড়িয়ে দেয়। কানকে আগে বাড়ায় না। আল্লাহ তায়ালাই তাকে এতটুকু বিবেক বুদ্ধি দিয়েছেন। অর্থাৎ মানুষের সকল প্রয়োজন পূরণ করেন আল্লাহ।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

কেবল অনুগ্রহ আর অনুগ্রহ

এই যে আল্লাহ তায়ালা সকল প্রয়োজন পূরণ করছেন

اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

এ কেবল তাঁর অনুগ্রহই অনুগ্রহ। এর পেছনে তাঁর কোন স্বার্থ নেই। তিনি সয়ম্ভু মুখাপেক্ষিতাহীন। মতলব মুক্ত। কিন্তু তিনি আমাদের সকল প্রয়োজন মেটাচ্ছেন; তাছাড়া আকাশ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যেন এগুলো দেখে তাঁকে জানতে পারি। ঈমান আনতে পারি। যেন আমরা বুঝতে পারি যিনি এত বড় বড় প্রয়োজন মেটাচ্ছেন নিশ্চয় তিনি কৃতজ্ঞতার উপযুক্ত। আর আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা জানাবার একটাই পথ আমাদের এই সাড়ে পাঁচ ফুট শরীরকে তাঁর নির্দেশ মাফিক চালিত করা।

দুই প্রকার মানুষ এবং তাদের পরিণতি

তাহলে বুঝা গেল মানুষ দুই প্রকার। ১. কৃতজ্ঞ। ২. অকৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ

বান্দারা আল্লাহর নির্দেশ মাফিক নিজের দেহকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে। আল্লাহর গায়বী সাহায্য এদের সাথে থাকে। আর যারা অকৃতজ্ঞ তারা তো আল্লাহর নিয়ামতের কুফুরীকারী। তাদের জন্যে রয়েছে মহা পাকড়াও। এর শেষ ফয়সালা হবে কিয়ামতের দিন। কিয়ামতের দিন মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত হবে।

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ـ (پاره/٢٣)

'হে অপরাধীরা! আজ তোমরা আলাদা হয়ে যাও!' আর ঈমানদারদেরকে ফেরেশ্‌তারা বলবেন–

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ـ حَتّٰى اِذَاجَآءُوْهَاوَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَاسَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ (پاره/٢٤)

'যারা আপন প্রভুকে ভয় করে তাদেরকে জান্নাতের দিকে টেনে নেয়া হবে। যখন তাঁরা বেহেশতের কাছে উপনীত হবে বেহেশ্‌তের সমূহ দরজা খুলে দেয়া হবে। বেহেশতের প্রহরীরা বলবে ঃ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক! তোমরা পবিত্র! সুতরাং তোমরা প্রবেশ কর অনন্তকালের জন্যে।'

বেহেশতে রাত নেই

ঘুমের পালা শেষ হয়ে যাবে কবরের মধ্যেই। নাশতা পর্ব হবে আরশের ছায়ার তলে। পানি পান করবে হাউজে কাউছারের । দুপুরের খানা খাওয়া হবে বেহেশতে। সেখানে কোন রাত নেই। এখন অনন্তকালের জন্যে মজা কর। কারণ তোমরা আল্লাহকে প্রভু মেনেছ। আল্লাহ তোমাদের প্রয়োজন পূরণ করতেন। আর সেটাকে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ মনে করতে। আকাশ ও পৃথিবী দেখে তোমরা আল্লাহকে চিনেছ। সর্বাবস্থায় তোমরা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করেছ। নিজের সর্বাঙ্গকে আল্লাহর নির্দেশ মাফিক পরিচালিত করেছ।

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

'হে আল্লাহ! যখন আপনিই আমাদের প্রয়োজন পূরণ করছেন, আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করছেন নিঃস্বার্থভাবে। কিয়ামতের দিন আপনি কৃতজ্ঞ-অকৃতজ্ঞকে দুই দলে বিভক্ত করবেন। অতঃপর সংঘটিত হবে চূড়ান্ত ফয়সালা। সুতরাং হে প্রভু!' আমি তোমারই ইবাদত করি; তোমার কাছেই সাহায্য চাই।"

আল্লাহকে মান; আল্লাহর কাছেই চাও!

হে আল্লাহ! আমরা তোমার কথাই মানি। তোমার কাছেই চাই। তোমার কথাই মানব। তোমার কাছেই চাইব। হ্যাঁ, তুমি যদি অন্য কারও কাছে চাওয়ার অনুমতি দাও তাহলে সেটাও চাইব – তোমার নির্দেশেই, তুমি নবীর কথা মানতে বলেছ, সেতো তোমার কথাই মানা হলো। তুমি সাহাবায়ে কেরামের পেছনে চলতে বলেছ, তাদের পেছনে চলাতো তোমাকে মানারই নামান্তর। তুমি বলেছ, স্বীয় যমানার আল্লাহওয়ালাদের কথা মানতে।

وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ (پاره/٢١)

'আমার প্রতি নিবেদিতদের পথে চল।'

সুতরাং আল্লাহওয়ালাদের পথে চলাও তোমাকেই মানা। তোমাকেই মানি। তোমার কাছেই চাই। إِيَّاكَ نَعْبُدُ এর কি অর্থ?

আল্লাহ যা বলবেন আমরা তাই করে দেখাব! اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ এর কি অর্থ ?

আমরা যা বলব আল্লাহ তাই করে দিবেন। حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ এর কি অর্থ?

আল্লাহ যা বলবেন আমরা তাই করব! حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ এর কি অর্থ?

আমরা যা বলব আল্লাহ তাই করে দিবেন।

আমরা যা বলব আল্লাহ তাই করবেন। তবে শর্ত হলো, সেটা আমাদের জন্যে কল্যাণকর হতে হবে। কিন্তু আমরা যদি আমাদের কল্যাণ বিরোধী কিছু চেয়ে বসি তাহলে আল্লাহ আমাদের কল্যাণ মাফিকই দান করবেন।

সুতরাং এটা আল্লাহর অনেক বড় অনুগ্রহ যে, আমরা যা চাই হুবহু ওটাই দেন না। বরং আমাদের জন্যে যা কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক তাই দেন।

চাইতেও শিখিয়েছেন আল্লাহ

আল্লাহ তায়ালার কাছে আমরা কিরূপ সাহায্য চাইব সেটাও আমাদেরকে শিখিয়েছেন। যদি এটা মানুষের হাতে ছেড়ে দিতেন, তাহলে আল্লাহ জানেন কে কি চাইত! মানুষ ছোট ছোট জিনিস চেয়ে বসত। কেউ বলত, হে

আল্লাহ! আমার পানি মিষ্টি করে দাও! কেউ বলত , আমার যেন কেবল কন্যা সন্তান হয়। কেউ চাইত শুধুই পুত্র সন্তান। কেউ বলত আমি যেন এখানে পৌঁছি, কেউ বলত ওখানে! কেউ চাইত এটা কেউ চাইত ওটা।

কিন্তু আল্লাহ তায়ালা অপার করুণাবশে আমাদেরকে প্রার্থনাও শিখিয়েছেন।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

'হে আল্লাহ! আমাকে সরল পথ দেখাও।' সরল পথে চালাও এবং গন্তব্যে পৌঁছে দাও। সেই সরল পথ কি?

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

'তাদের পথ যাদের প্রতি তুমি নিয়ামত বর্ষণ করেছ।'

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّالِّيْنَ

অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্টদের পথে নয়।' আর সেটাই হলো, নবীগণের পথ!

আমাদের প্রতি মহান প্রভুর কত যে অনুগ্রহ দয়া ও অনুকম্পা! আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন ঃ বান্দা যখন পড়ে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

'সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যে– তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

حَمِدَنِىْ عَبْدِىْ

'আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে।' বান্দা যখন বলে–

اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম মেহেরবান-

আল্লাহ তায়ালা জবাবে বলেন–

اَثْنٰى عَلَىَّ عَبْدِىْ

আমার বান্দা আমার গুণকীর্তন করেছে। বান্দা বলে–

مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ

'বিচার দিবসের মালিক! উত্তরে আল্লাহ বলেন–

مَجَّدَنِىْ عَبْدِىْ

'আমার বান্দা আমার মর্যাদা ও সম্মানের কথা বর্ণনা করেছে। অতঃপর বান্দা যখন বলেন–

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

'হে আল্লাহ! তোমারই ইবাদত করি, তোমার কাছেই সাহায্য চাই।' তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ বান্দা এর মধ্যে তো আমারও আছে তোমারও আছে। ইবাদত আমার, সাহায্য তোমার! প্রথম তিন আয়াতে কেবল আমারই প্রশংসা করেছো। আর এই আয়াতের অর্ধেক আমার, অর্ধেক তোমার। সাড়ে তিন আয়াত আমার আর আগামী সাড়ে তিন আয়াত

إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত আমার বান্দার।

নামাযের বাইরে ও আমাদের জীবন পরিচালিত হবে আল্লাহর হুকুম মুতাবিক

এই ধ্যানে যদি আমরা নামায আদায় করি তাহলে আমাদের জীবন কত সুখময় হবে। আমি বলি, নামাযের মধ্যে যে স্বাদ মজা ও আনন্দ আছে তা আর পৃথিবীর অন্য কিছুতে নেই।

নামাযের মধ্যে আমরা যেভাবে আমাদের শরীরকে আল্লাহর হুকুম মুতাবিক ব্যবহার করছি নামাযের বাইরেও যদি আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক চালিত করি তাহলে নামাযের বাইরে গিয়েও আমরা আল্লাহর বান্দাই থাকব। ঘর-বাড়ি, ব্যবসা-বাণিজ্য সর্বক্ষেত্রেই আমাদের জীবন আল্লাহর হুকুম মুতাবিক চলবে। অতঃপর অন্যদের মধ্যেও এই কথাগুলো প্রতিষ্ঠা করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে হবে।

আল্লাহর বড়ত্ব বর্ণনা কর আল্লাহ'র ভয় দেখাও

قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ

'ওঠ, মানুষকে ভয় দেখাও! তোমার প্রভুর বড়ত্বের কথা বল!' 'বল' দেখ ভাই! আল্লাহকে মান, আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ অনেক বড়। কিন্তু বেঈমানরা বলবে, কেন মানব? তখন বলবে, দেখ ভাই! পূর্ববর্তীদের যারা আল্লাহকে ভয় পায়নি তাদের যে দশা হয়েছিল তোমাদের কিন্তু সেই একই দশা হবে। রীতিমত ভয় দেখাতে থাক, যেন পিস্তল হাতে তুমি এক সৈনিক!

আল্লাহর আযাব যেন পিস্তলের নিক্ষিপ্ত গুলি

কিন্তু যখন তারা মানবেই না, তখন যে সব বিষয়ে তাদেরকে ভয় দেখানো হয়েছিল আল্লাহ তায়ালা সেগুলো সামনে হাজির করে দিবেন। যেন পিস্তল থেকে গুলি নিক্ষিপ্ত হলো! সে গুলি আসবে বন্যার আকৃতিতে, ঝড়ের আকৃতিতে, লেংড়া মশার আকারে, আবাবীলের মত ক্ষুদ্র পাখির আকারে। বড় অদ্ভুতভাবে আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করবেন। শক্তি দিবেন।

একটি কথা শুনে নাও! গুলিতে বাঘ মারা যায়। কিন্তু কখন! যখন গুলি যথাস্থানে রাখা হবে। আর গুলি রাখার জায়গা হলো বন্দুক। বন্দুকের ভেতর গুলি রাখলে বাঘ মারা যায়। কিন্তু কেউ যদি গুলি রুমালে কিংবা পেয়ালায় রেখে কারও প্রতি নিক্ষেপ করে তাহলে বাঘতো দূরের কথা, বিড়ালও মরবে না।

এই যে দুনিয়া বোঝাই মন্দ ও ভন্ড লোকদের চড়াই-উৎড়াই চলছে তার কারণ একটাই, গুলি রুমাল কিংবা পেয়ালায় করে মারা হচ্ছে। আর মনে করা হচ্ছে আল্লাহর সাহায্য আসবে। যেভাবে অতীত যুগে এসেছিল।

পুরো শরীর কুরআন-হাদীসের অনুগত মানেই বন্দুকের মধ্যে গুলি

কিন্তু এটা কেউ লক্ষ্য করে না, যখন মানুষের সাড়ে পাঁচ ফুট শরীরের পিস্তল ও বন্দুক আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক চালিত হত তখনই আল্লাহর সাহায্য আসত।

এই সাড়ে পাঁচ ফুটের মধ্যে চোখ আছে। তাই কুরআন চোখ সম্পর্কে যে কথা বলেছে চোখকে তা মানতে হবে। পাকে মানতে হবে পা সম্পর্কিত নির্দেশ। এভাবে সমগ্র শরীর যখন কুরআন-হাদীসের নির্দেশের আওতায় এসে পড়বে তখন মনে করবে গুলি বন্দুক ও পিস্তলের ভিতরে এসেছে।

কিন্তু যদি এমন হয়, কুরআনে আছে– হাদীসে আছে; কিতাবে আছে, ওয়াজ ও বক্তৃতায়ও আছে কিন্তু বাস্তব জীবনে নেই। তাহলে বুঝতে হবে গুলি বন্দুকে নেই। এই গুলি দিয়ে বিড়ালও মারা যাবে না।

আপনি বিড়ালকে মারছেন, বিড়াল আপনাকে ঠাট্টা করছে। কুকুরও ঠাট্টা করছে। বাঘ উপহাস করছে। আপনি বলছেন, 'আল্লাহু আকবার' আল্লাহ সবার বড়। তাঁকে ভয় কর। তারা বলছে, দেখ তের বছরে তো তোমার আল্লাহ কিছুই করলনা।

তারপর বদর যুদ্ধে এসে গুলি ছুটল। সেখানে তাদের বড় বড় সত্তর জন চৌধুরীর অপারেশন হলো। যখন এই চৌধুরীদের বিষ ফোঁড়ার অপারেশন হলো, তখন অন্যেরা এমনিই বলে ওঠল, দেখ এরা আঁল্লাহ বড় – আল্লাহ বড় বলে। তাদের প্রতি আল্লাহর সাহায্যও এসেছে। চল ভাই, আমরাও আল্লাহকে মানি। যে আল্লাহ এমন দুর্বলদের সাহায্য করেন আমরাও সেই আল্লাহকেই মানব।

এখন আবু সুফিয়ানও আল্লাহকে মানতে শুরু করে দিল। আবু জাহেলের নন্দন ইকরিমাও এ দলে এসে পড়ল। আবু জাহেলের ভাইও এসে পড়ল। সকলেই মানতে শুরু করল 'আল্লাহ বড়।'

দু'আ এবং চেষ্টা

আমরা নিয়মিতই মসজিদে এসে

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

এর প্রার্থনা করছি। দু'আ করছি। কিন্তু যখন ঘরে যাই, ব্যবসায় যাই তখন নবীর দুশমনদের পথে চলি।

ভাই! দু'আ এবং মেহনতের সমন্বয় হতে হবে। আজ বিশ্বজুড়ে মুসলমানগণ অস্থির। কারণ তাদের দু'আ এক পন্থী, চেষ্টা তার সম্পূর্ণ বিপরীতপন্থী।

দু'আ এবং চেষ্টা

আমরা নিয়মিতই মসজিদে এসে

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

এর প্রার্থনা করছি। দু'আ করছি। কিন্তু যখন ঘরে যাই ব্যবসায় যাই তখন নবীর দুশমনদের পথে চলি।

ভাই! দু'আ এবং মেহনতের সমন্বয় হ'তে হবে। আজ বিশ্বজুড়ে মুসলমানগণ অস্থির। কারণ, তাদের দু'আ এক পন্থী, চেষ্টা তার সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থী।

দু'আ করছে–নবীদের দু'আ। মসজিদের বাইরে গিয়ে কাজ করছে নবীদের দুশমনদের মত।

ভাই! যে ধরনের দু'আ হবে ঠিক সেই জাতীয় মেহনত ও চেষ্টা হতে হবে। আল্লাহর কাছে দু'আ করলে, হে আল্লাহ! আমাকে সন্তান দাও! কিন্তু তার

জন্য তো আগে বিয়ে করতে হবে! দু'আ করল, হে আল্লাহ! আমার ক্ষেতে বরকত দাও! কিন্তু তার জন্য তো জমি চাষ করতে হবে। আল্লাহর কাছে সন্তান চাইলে কিন্তু বিয়েই করলে না: আল্লাহর কাছে বরকতের প্রার্থনা করলে কিন্তু জমি চাষই করলে না–এতে কোন ফল হবে কি?

যাবে বোম্বাই ট্রেনে চড়েছ কলকাতার একটি উপমা শুনুন!

একলোক বোম্বাই যাবে! সে দেখল, বোম্বাইয়ের ট্রেনে খুব ভীড়। একটু সামনেই লক্ষ্য করল, এক-দুটি ট্রেন খালি পড়ে আছে। সে ওই খালি ট্রেনেই ওঠে পড়ল। এই ট্রেন ছিল কলকাতার। এখন ট্রেনে বসে সে দু'আ করছে-হে আল্লাহ! আমার খানাও হালাল, কাপড়ও হালাল, আমি তাবলীগও করছি, দুআ কবুলের সকল শর্ত আমার মধ্যে আছে। সে খুব কান্নাকাটি করছে। হে আল্লাহ! ভালোয় ভালোয় আমাকে বোম্বাই পৌঁছে দাও! দু'আ নিজেও করছে। আমার সৌদী আরবের বন্ধুদের কাছেও ফোন করে দিয়েছি দু'আর জন্যে এখন তার জন্যে বাইতুল্লাহ ও মসজিদে নববীতে দু'আ হচ্ছে। সারা জগতের সকল অলি আউলিয়াদের দরবারে ফোন করা হয়েছে। সকলেই কেঁদে কেঁদে দু'আ করছে। সে যেন ভালোভাবে বোম্বাই পৌঁছতে পারে।

বসে আছে কলকাতার ট্রেনে। আর দু'আ হচ্ছে বোম্বাই পৌঁছার। মসজিদে দু'আ করছে নবীওয়ালা দু'আ। আর বাইরে গিয়ে কাজ করছে নবী দুশমনদের। এখন দু'আর আর কাজের মধ্যে সংকট হচ্ছে। তোলা ওজনের ঠোট নড়তেছে বোম্বাই যাবার জন্যে আর আড়াইমণ ওজনের শরীর নড়তেছে কলকাতা যাবার জন্যে।

মসজিদে তোলা ওজনের ঠোঁট নড়তেছে নবীসুলভ দু'আয়। আর বাইরে আড়াইমণ ওজনের শরীর নড়তেছে অভিশপ্ত পথভ্রষ্টদের কার্যকলাপে। দু'টোর মধ্যে সমন্বয় হচ্ছে না। তাই আমরা বলি, সমন্বয় করতে হবে।

চারদিকে দু'আ খুব হচ্ছে। কিন্তু ট্রেন যখন পৌঁছবে 'ইনশাআল্লাহ' কলকাতায়-ই পৌঁছবে। বোম্বাই-এ পৌঁছবে না।

প্রতি দিন কোটি কোটি মুসলমান নবীদের মতোই দু'আ করছে। 'হে আল্লাহ! আমাদেরকে সরল পথের সন্ধান দাও! কিন্তু তার সাথে পরিশ্রম তো করতে হবে সে পথের। ইরশাদ হচ্ছে–

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا -

অর্থাৎ তুমি যখন পথ চলতে শুরু করবে তখন তোমার পথ উন্মোচিত হতে থাকবে। এখান থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকবে তাহলে রাস্তা তোমার কাছে বন্ধ মনে হবে। সুতরাং চলতে থাক। পথ উন্মোচিত হতে থাকবে।

'চারমাস' একটি প্রশিক্ষণ

এখন তোমরা বলবে, ভাই! তাহলে কারবার ঘর-বাড়ি ছেড়ে দেব? না। মোটেই না। চারমাস দিয়ে নিজের শরীরকে কুরআন-হাদীস মুতাবিক চালাবার প্রশিক্ষণ নিয়ে নাও! তাহলে ইনশাআল্লাহ! গুলি বন্দুক ও পিস্তলের ভিতর এসে পড়বে। ইরশাদ হচ্ছে–

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ -

'মুমিনদেরকে দৃষ্টি আনত রাখতে বলে দিন।' এখন কেউ যদি দৃষ্টি আনত রাখতে শুরু করে তাহলে কুরআনের এই আয়াত তার চোখের মধ্যে এসে পড়ল। পা সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে–

يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا

'তারা পৃথিবীতে বিনয়ের সাথে চলে।' এটা মানলে কুরআনের এই আয়াত পায়ের মধ্যে এসে পড়ল। অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে–

يَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

'তারা আসমান-জমিনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে।' এর উপর আমল করলে যেন কুরআনের এই আয়াত মেধায় জায়গা করে নিল। তাকওয়া ও তায়াক্কুল সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে– এখানে আয়াতের উল্লেখ নেই। অনুবাদক।

'তাকওয়া ও তাওয়াক্কুলের স্থান অন্তর।' তাহলে তার অন্তরেও যেন কুরআনের আয়াত এসে পড়ল।

মুহ্তারাম বন্ধুগণ!

শরীরের প্রতিটি অঙ্গ কুরআন-হাদীস মুতাবিক পরিচালিত হবে। এর জন্যে নিজের সময়কে খালি করে চার মাস আল্লাহর রাস্তায় কাটিয়ে দিন। ইনশাআল্লাহ পথ চলা হয়ে যাবে।

আমীন!!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا. وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا اَمَّا بَعْدُ.

জীবন নির্বাহের পথ দু'টি

মুহতারাম বন্ধুগণ!

এই পৃথিবীতে জীবন নির্বাহের পথ দু'টি। একটি সরল অন্যটি বাঁকা। সরলপথ আল্লাহর সন্তুষ্টি পর্যন্ত পৌঁছায়। সরল পথের যাত্রী মুখোমুখি হয় দুনিয়ার শত কঠিন পরীক্ষার। শত প্রতিকূলতার মধ্যে এগিয়ে যেতে হয় তাকে। পরম করুণাময় আল্লাহ সাহায্যও করেন তাকে।

সরলপথের যাত্রী রূহানিয়্যাতের অমিয় শক্তিতে বলীয়ান হোন, আত্মিকতায় বলিষ্ঠ থাকে তার প্রতিটি পদচারণা। অবশ্য তাঁর এই শক্তি-বীর্য অন্যদের নজরে পড়ে না। বক্রপথের যাত্রীরাও দেখতে পায় না তাদের দুর্ভেদ্য রূহানী হিম্মত, পাহাড়সম আত্মিক ক্ষমতা। বরং তাদের চোখে এরা খুবই সাধারণ।

বাঁকা পথে যারা চলে তারা আল্লাহর অসন্তুষ্টিতে হারিয়ে যায়। আল্লাহর রহমত ও করুণা থেকে দূরে সরে পড়ে। জীবন হয় তাদের উন্মুক্ত বিস্তীর্ণ। এখানে কামনা, বাসনা, স্বার্থপরতা, ভোগ-বিলাসের কোন বাধা নেই।

পৃথিবীতেই জাহান্নামের চিত্র

এই বক্রপথের সকল যাত্রীই ভাবে, কিভাবে তার কামনা পূরণ হবে, তার স্বপ্ন কিভাবে হবে বাস্তবায়িত। সকলেই যখন নিজের স্বপ্ন নিয়ে ব্যস্ত থাকবে তখন আর অন্যের স্বপ্ন কি বাঁচবে না মরবে সেটা দেখার সুযোগ হয় না। ফলে সে নিজের স্বপ্ন পূরণ করতে গিয়ে অনেকের স্বপ্ন সাধ আহ্লাদ পদদলিত করে। পক্ষান্তরে যাদের কামনা-বাসনা পদদলিত হচ্ছে তারাও সেই একই শ্রেণীর। তারাও তাদের বাসনা পূরণে কৃতসংকল্প। তাই অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যখন একজনের বাসনা পূরণের আঘাতে অনেকের বাসনা মুখ থুবড়ে পড়ে যায় তখন পরাজিতরা সকলেই সুযোগ ও সময়ের অপেক্ষায় থাকে। ভাবে, যদি কখনো সুযোগ পাই তাহলে সকলে মিলে আমাদের বাসনা পূরণ করবং। পরিণামে পরাজিতরা সকলেই সেই একজনের শত্রুতে রূপায়িত হবে।

পরাজিতরা সকলেই এখন এই একজনের স্বপ্নভঙ্গের ফিকির করে। সুযোগ খুঁজে ফিরে। এটা মানুষের জন্যে খুবই কঠিন ও ভয়ানক। অথচ তার সবই আছে। রাজত্ব আছে, অর্থ কড়ি, স্বর্ণ-রূপা, মিল-ফ্যাক্টরী, ঘর-বাড়ি, লোক-লশকর সব কিছুই বিপুল পরিমাণে আছে। এতদসত্ত্বেও এই পৃথিবীতে বসে জাহান্নামের চিত্র দেখতে পায়। সে মানসিকভাবে থাকে অস্থির-বিচলিত। প্রশান্তি নেই তার জীবনের কোথাও।

উভয় জগতে শান্তি

পক্ষান্তরে যারা সরলপথের যাত্রী, সিরাতে মুসতাকীমের যারা পথিক তারাও কি বাধা বিপত্তির মুখোমুখি হন? পরীক্ষা আসে তাদের জীবনেও। তারাও প্রতিকূলতার শিকার হন। কিন্তু তাদের কষ্ট, যাতনা, বাধা, অন্তরায় ও পরীক্ষা আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার আত্মিক উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে। পরীক্ষার সিঁড়িতে চড়ে সে ওঠে যায় ঈমানের সুউচ্চ আসনে। ঈমানের শক্তির সাথে বৃদ্ধি পায় আল্লাহর সাহায্য। ঈমানের এক ধাপ অতিক্রম করে এলাহী সাহায্যের অনেক পাথেয় হাতে করে। ইহকাল-পরকাল তার ভরে ওঠে মানসিক তৃপ্তি-আন্তরিক সুখ ও শান্তিতে।

মৃত্যু!

সম্মানিত বন্ধুগণ!

মৃত্যুর একটি ব্যাপারে আছে। মৃত্যুর বিধান একান্তই অবিসংবাদিত। যখন যেখানে যে অবস্থায় এসে যাবে সেখানে সে অবস্থাতেই মরতে হবে। মৃত্যু কোন্ দিন আসবে? কোথায় আসবে? কেউ জানে না। জানেন কেবল আল্লাহ। কিন্তু যিনি হিজরত অবস্থায়- আল্লাহর জন্যে ঘর-বাড়ি ছাড়া অবস্থায় মারা যায়- সে আল্লাহর কথা মানতে মানতে মরল। তার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট!

এ ধরনের লোকদের মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা হাজির হয় তাদের সকাশে। এসে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানায়। সান্ত্বনা জানায়। বলে দেয়, চিন্তা করোনা। ভবিষ্যতের জন্যেও না, বর্তমানের জন্যেও না। তোমাদেরকে যে বেহেশতের অঙ্গীকার করা হতো সেই বেহেশতের সুসংবাদ নাও!

আল্লাহর দৃশ্য ও অদৃশ্য বিধান

আল্লাহ পাক এমন কিছু কাজও করেন যা মানুষ দেখতে পায়। কিছু কাজ এমনও করেন যা কেউ দেখতে পায় না।

যে সব কাজ মানুষের নজরে পড়ে সেগুলোকে বাহ্যিক বিধান আর যেগুলো নজরে পড়ে না সেগুলোকে অদৃশ্য বিধান বলা হয়। অদৃশ্য বিধান মানুষের পক্ষে হলো কি বিপক্ষে মানুষ তা দেখতে পায় না। বাহ্যিক বিধান মানুষের স্বার্থেই ব্যবহৃত হয়। এর পক্ষ- বিপক্ষ উভয় রূপই মানুষ দেখতে পায়। মানুষ পরিষ্কার তা অনুভব করতে পারে। আর মানুষ যখন নিজের দেখা পথে চলে তখন খুব বুঝে-শুনেই চলে।

বাহ্যিক আইন-কানুনের অবস্থা

সম্মানিত বন্ধুগণ!

আমি তিনটি কথা বলেছি।

এক. দেখা পথে চলা।

দুই. বুঝে শুনে চলা।

তিন. নিজের শক্তিতে চলা।

এর ফল এই দাঁড়ায়, মানুষ যে কাজ করে আল্লাহ তায়ালা তার প্রতিদান দেন। মানুষ যা দেখে খুব সামান্যই দেখে। পুরোটা সে দেখে না। আর যা

দেখে তারও সামান্যই বুঝে আসে তার। প্রথমত, মানুষ যা দেখে তা খুবই সামান্য। মায়ের পেটে অবস্থান করে সে। অথচ পেটের পুরোটা দেখতে পায় না। পৃথিবীর গর্ভে অবস্থান করে অথচ পুরো পৃথিবী দেখতে পায় না। মানুষ যেখানে অবস্থান করে ঘেরাও অবস্থায় অবস্থান করে। তাকে ঘিরে রেখেছে পৃথিবী। পৃথিবীই আবার তাকে সব কিছু দেখতে দেয় না। মানুষ সময়কেও দেখতে পায় না। অতীত কাল তার কাবুর বাইরে। ভবিষ্যতের উপরও তার হাত নেই। মানুষ শুধু বর্তমানটাই ধরতে পারে। অথচ বর্তমানটার মোটেই স্থায়িত্ব নেই। এখন সাতটা দশ মিনিট। একটু পরেই সাড়ে সাতটা বেজে যাবে। তার একটু পরেই অবসান হবে একটি পূর্ণ দিবসের। সুতরাং বর্তমানটাও মানুষ ধরে রাখতে পারে না।

মানুষ পেছন থেকে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আর সময় ধাবিত হচ্ছে সামনের দিক থেকে পশ্চাতের দিকে। আজ এই মুহূর্তে এই বাঙালোরে যে সময়টা এই সুধী সমাজকে স্পর্শ করছে মূলত এটাই অবশিষ্ট থাকবে। আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

বর্তমান পরিস্থিতি কিয়ামতাবধি সকলের জন্যে পথ নির্দেশ

নবীজীর কথা ও কর্মমালা আমাদের পথ প্রদর্শক। কিয়ামত পর্যন্ত সকলের জন্যে পথ নির্দেশক। এর জন্যে মক্কার তের বছর ও মদীনার দশ বছর আমাদের জন্যে পথ নির্দেশক।

রাসূল (সাঃ) যখন এই পৃথিবী থেকে চলে গেলেন তখন রয়ে গেল শুধু তাঁর আদর্শস্নাত তরীকা– জীবন পদ্ধতি। এ পদ্ধতি অবলম্বন করে পথ চলবে কিয়ামত পর্যন্ত সকল উম্মত। এর জন্যে যে যুগের আগমন ঘটেছে তা আর পূর্বে কখনো ঘটেনি। নবীজীর পূর্বে কোন নবীর ওফাত হলে সেকালের বুদ্ধিমান, শান্তিপ্রিয়, দ্বীনদার লোকেরা নতুন নবীর আর্বিভাবের অপেক্ষা করত। তারপর যখন সে নবীর আগমন হতো খুব সামান্য লোকই তাঁকে সমর্থন করত। তাঁদের বিরুদ্ধে দাঁড়াত বিপুল সংখ্যক লোক। এ ছিল সামগ্রিক অবস্থা। কিন্তু রাসূল (সাঃ)- এর পর আর কোন নবীর আগমন ঘটবে না।

নবীজীর পর খোলাফায়ে রাশেদার যুগ আমাদের পথ প্রদর্শক

এখন নবীজীর ইন্তেকালের পর নবীজীর কাজ নবীজীর তরীকামত কিভাবে চলবে? কারণ, এখন নবী নেই! কিন্তু নবীজীর রেখে যাওয়া কাজ কিভাবে

পরিচালিত হবে, কোন তরীকায় পরিচালিত হবে সে পথ নির্দেশ করেছেন স্বয়ং রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ

'তোমরা আমার পথ আকড়ে ধর এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের পথ।' নবী সত্তার বিয়োগের পর নববী কর্মমালাকে নববী আদর্শে বাস্তবায়নের নামই খিলাফত-আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব। এই প্রতিনিধির পথ রাসূল (সাঃ)-এর তেইশ বছরের নববী জিন্দেগী, খোলাফায়ে রাশেদার যুগ এবং একজন সাহাবীর বর্তমান পূর্ণ যুগই পরবর্তী কিয়ামত পর্যন্ত আগতব্য সকল মানুষের জন্যে আদর্শ, সুন্দরতম নমুনা। তাই সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) ইন্তিকালের পর আবির্ভূত আমাদের সকল বুযুর্গ, মাশায়েখ, ওলামা ও আওলিয়ায়ে কেরাম সাহাবাগণের পথকেই অনুসরণ করেছেন। আপাতত যে কোন সংকট ও সমস্যার ক্ষেত্রে তারা কুরআন-হাদীস ও সাহাবীগণের জীবনের মধ্যেই তার সমাধান খুঁজেছেন। চিন্তা করেছেন সে আলোকেই। তাঁরা চিন্তিত হয়েছেন, অস্থির হয়েছেন, দু'আ করেছেন, কান্নাকাটি করেছেন। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে পথ খুলে দিয়েছেন। কিয়ামত পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকবে।

নবুওয়তের পর প্রথম কাজ

নবীজীর যুগ থেকে আমরা বেশ কিছু শিক্ষা পাই। খোলাফায়ে রাশেদার যুগেও আমাদের জন্যে অনেক শিক্ষা রয়েছে। এখন আমরা যে সব অবস্থার মুখোমুখি হব, পারিবারিকভাবে যে সব সংকটের শিকার হব, আমাদের ব্যক্তিগত অবস্থা, জাতীয় অবস্থা, রাষ্ট্রীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে আমাদের যে সংকটময়তা- এর নিরসনে এ থেকে উত্তরণের জন্যে আমরা কি করব? আমাদের সেই নববী ও সাহাবী যুগ থেকেই তা উদ্ধার করতে হবে- নিরূপণ করতে হবে।

নবী জীবনের তের বছর ছিল ঈমানী দাওয়াতের বছর। নবুওয়াত প্রাপ্তির পর সর্বপ্রথম রাসূল (সাঃ) ঈমানের দাওয়াত দিয়েছেন। তিনি বার বার বলতেন ঃ

يَاۤاَيُّهَا النَّاسُ ! قُوْلُوْا لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تُفْلِحُوْنَ ـ (الحديث)

'হে মানব জাতি! তোমরা বল, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তোমরা সফলকাম হবে।'

তিনি (সাঃ) যখন এই দাওয়াত দিয়েছেন তখন মানুষ সঙ্গে সঙ্গেই মেনে নেয়নি। তবে যারাই মেনেছে কঠিন ও দৃঢ়ভাবে মেনেছে। কালেমার সেই দাওয়াতের কথা কেবল এই ছিল– 'হে মানব জাতি! তোমরা বল, আল্লাহ ছাড়া মা'বুদ নেই। তাহলেই তোমরা সফলকাম হয়ে যাবে। এ কথায় স্বীকৃতি দাও, দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন কর যে, আল্লাহ-ই শুধু মা'বুদ আর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল।

সব কিছু করেন তো আল্লাহ! তাঁর শক্তি অসীম। তাঁর ভান্ডার অপরিসীম। তাই তাঁর ইবাদত ও আনুগত্য অনিবার্য। আনুগত্য করলেই উভয় জাহানের জীবন গড়বে। চাই ধনী হোক, গরীব হোক; অবস্থা অনুকূল হোক, প্রতিকূল হোক; দল বড় হোক, ছোট হোক, আল্লাহ যাকে পথ দেখাবেন তার জীবন সফলতায় ভরে ওঠবে আর যাকে পথের দিশা থেকে বঞ্চিত করবেন তার জীবন হবে ব্যর্থতার পর্যবসিত।

বন্ধুরা! দাওয়াতের পথেই এর বাস্তবায়ন ও প্রশিক্ষণ রয়েছে।

কষ্ট সাময়িক

দাওয়াতের এ পথে কষ্ট আসে। এ কষ্ট সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) জীবনেও এসেছে। অবশ্য এতে অনেক সময় মানুষ ভয় পেয়ে যায়। ভয় পেয়ে অনেকেই পথ ছেড়ে দেয়। এমতাবস্থায় কুরআনে কারীম পথ দেখাবে। পবিত্র কুরআনে সবিশেষ কয়েকটি বিষয় স্থান পেয়েছে। আখেরাতের জীবন সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। যাতে করে মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়ে যায়, এই পৃথিবীর জীবন নশ্বর-অস্থায়ী। প্রকৃত জীবনতো হলো পরকালীন জীবন। সুতরাং এখানকার দুঃখ-কষ্টও সাময়িক-অস্থায়ী।

মক্কায় যখন কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে সেখানে কিয়ামতের আলোচনা সবিশেষ হয়েছে। দ্বিতীয়ত, আলোচনা হয়েছে বেহেশ্ত দোযখের। তৃতীয়ত, আলোচনা হয়েছে পূর্ববর্তী উম্মতের। সেখানে এ কথাও বিধৃত হয়েছে যে, নবীগণ দু'টি কথার প্রতিই মানুষকে আহ্বান করতেন। কালেমা এবং নামায। যেমন–

يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ

'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তোমাদের মা'বুদ নয়।' আল্লাহর ইবাদত বলতে 'নামায' আর আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই বলতে 'কালেমা'কে বুঝানো হয়েছে। এই

কালেমা যদি শক্তিশালী হয়ে ওঠে, নামায যদি হয়ে ওঠে জীবন্ত তাহলেই আল্লাহর সাহায্য আসবে।

কুরআনে পুরনো যুগের কাহিনী কেন?

সম্মানিত বন্ধুগণ!

যদি আশিজন লোক এই গুণের অধিকারী হয়ে ওঠেন তাহলে পুরো সম্প্রদায় মিলেও তাদেরকে প্রতিহত করতে পারবে না। যেমন আদ সম্প্রদায়ের সকলে মিলেও সামান্য কয়েকজনকে পরাজিত করতে পারেনি। আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বাতাস এলো-আর সব নিশ্চিহ্ন!

রাসূল (সাঃ) কালেমার দাওয়াত দিতে শুরু করলেন। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে যেই কালেমা পড়েছে সেই দাওয়াত দিতে শুরু করেছে। তাঁর উপর কষ্ট ও নির্যাতনের ঝড় এসেছে। তখন কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। অতীত কালের কাহিনী বিধৃত হয়েছে। নির্যাতীতরা সান্ত্বনা পেয়েছে। নবী ও তার অনুসারীদের প্রতি সব যুগেই নির্যাতন এসেছে। অবশেষে সাহায্যও এসেছে।

অবাধ্যদের পরিণতি

নবীদের দাওয়াত যারা মানেনি, নবীর অনুসারীদের কথা যারা মানেনি আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন। তারা খুব নর্তন কুর্দন করেছে। তারপর আল্লাহ এমন শক্তিতে আছড়ে মেরেছেন আর ওঠে দাঁড়াতে পারেনি। একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। যেমন ফোঁড়া হলে ভেতরে পূঁজ জমে। ফুলে ওঠে। মন্দলোকদেরকেও আল্লাহ তায়ালা অল্প সময়ের জন্যে ফুলে ওঠার সুযোগ দেন। তারা ফুলে- নাচে। ফুলতে ফুলতে যখন ভরে ওঠে তখন ঝরে যায়। যেমন ফেরাউন একটি বিষাক্ত ফোঁড়া ছিল। সে বলত ঃ

أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى

'আমিই তোমাদের সবচে' বড় খোদা।' আল্লাহ তায়ালা তাকে বড় হতে দিয়েছে। পূঁজ ভরতে দিয়েছেন। যখন পরিপূর্ণ হয়েছে ফেটে পড়েছে।

মনে রাখতে হবে, যার ভেতর মন্দ ভরে ওঠবে। পূঁজ ফুলে ওঠবে, মন্দে মন্দে স্ফীত হয়ে ওঠবে, মাঝখান থেকে আল্লাহ তাকে ছিদ্র করে দিবেন। ছিন্ন করে দিবেন। এটা আল্লাহর আর্ছন। যেন এ সকল ঘটনা থেকে কিয়ামতাবধি মানুষ সান্ত্বনা লাভ করে।

কুরআনের শিক্ষা অপরিহার্য

যখন দাওয়াত শুরু হয়েছে তখনই অত্যাচার শুরু হয়েছে। সাথে সাথে শুরু হয়েছে কুরআন শিক্ষার আসর। হযরত উমরের (রাঃ) বোন ও ভগ্নিপতিতো কুরআনেই শিখছিলেন। ঘরে ঘরেই তখন আসর জমে ওঠেছিল। সে আসর ছিল শিক্ষার। একমাত্র কুরআন শিক্ষার।

দাওয়াত ও শিক্ষার পরস্পর সম্পর্ক ও পার্থক্য

কুরআনে পাকের কয়েকটি স্তর রয়েছে। ১. তিলাওয়াত। অর্থাৎ শিক্ষার জন্যে পড়া। ২. দাওয়াত। অর্থাৎ অন্যের কাছে দাওয়াত দেয়ার জন্যে পড়া। অনুরূপভাবে–

سُبْحَانَ اللّٰهِ

সুবহানাল্লাহ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

আলহামদুলিল্লাহ

لَآاِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু

اَللّٰهُ اَكْبَرُ

আল্লাহু আকবার

এ গুলোকে যিকির হিসাবে পড়া– আরেক হলো এগুলো আল্লাহ পাকের প্রশংসা পবিত্রতা ও আল্লাহর বড়ত্ব অন্যের সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যে পড়া। এটা দাওয়াতের স্তর। আর একাকী নির্জনে বসে পড়লে হবে যিকির।

অন্যের সামনে করলে হবে দাওয়াত। চাই স্ত্রীর সামনেই হোক না কেন! অতঃপর দাওয়াতী কর্মের প্রতিকূলে সকল সাহায্য অবতীর্ণ হবে তার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে।

দাওয়াতের পথে কষ্টও আসে–সাহায্যও আসে

দাওয়াতের কাজ শুরু হলো। আপনি আল্লাহর পথে নামলেন। নির্যাতন শুরু হলো। কষ্টের ধারা প্রবাহিত হলো। সাথে তা'লীম– কুরআন শিক্ষা শুরু হলো। এ পথে কখনো কখনো আল্লাহ তায়ালা সুখকর পরিবেশও সৃষ্টি করেছেন। ভালো অবস্থারও সৃষ্টি হয়। এ পথে সাহায্য-সহযোগিতার

ঘটনাও ঘটেছে অতীতে। মক্কায় কেবল কষ্ট আর কষ্টই ছিল এমনটিই নয়। সেখানেও আল্লাহর সাহায্য ছিল। যেমন, আবু জাহিল রাসূল (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে একবার ফন্দি আঁটল এবং তা বাস্তবায়নের জন্যে এগিয়ে গেল। ভাবল, নবীজীকে কষ্ট দেবে। একথা ভাবতেই অকস্মাৎ পেছনে ফিরে এলো ঘাবড়ে যাবার ভঙ্গিতে। চোখ একেবারে কপালে। পরে সে নিজেই বলেছে, আমি যখন তাঁর দিকে এগুতে যাচ্ছিলাম তখন হঠাৎ ডানাবিশিষ্ট কি যেন নজরে পড়ল। যদি আরেকটু অগ্রসর হতাম তাহলে আমাকে একদম পিষে ফেলত।

মাঝে মধ্যে এই জাতীয় ঘটনাও ঘটেছে। রাসূল (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের সাথে ঘটেছে। বড় বিস্ময়কর ছিল সেসব ঘটনা। বিশেষ করে হযরত উমর (রাঃ)-এর সাথে ঘটেছে বেশ অলৌকিক ঘটনা। উমর (রাঃ) যখন হিজরত করলেন তখন লুকাননি। সকলের সামনে দিয়ে বীরের মত চলে গেলেন। বিস্ফারিত নেত্রে দেখেছে সকলে। সার কথা মক্কায় মুসলমানগণ উভয় পরিস্থিতির মুখোমুখিই হয়েছেন।

হযরত যিমাদ (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী

এক বড় কবি, বড় বাগ্মী হযরত যিমাদ (রাঃ)। তিনি মক্কায়। বেঈমানরা তাকে বলে দিল, শোন! আমাদের এখানে এক কান্ড ঘটেছে। এই লোকের (হুজুর সাঃ) কথা শোন না কিন্তু। মেনোও না। কারণ যেই তার কথা শুনে প্রভাবিত হয়। অনেক বড় কবি! অনেক বড় বক্তা! তিনি কানে আঙ্গুল দিলেন। যেন নবীজীর কোন কথা কানে না পড়ে। লোকজন তাঁর (সাঃ) দিকে ইংগিত করে বলল ঃ দেখ, ইনিই ! সাবধান! তিনি সাবধান হলেন। সে আরও কতক্ষণ! কিছুক্ষণ পরে ভাবলেন, আমি তো কোন বেকুব নই। আমার কথায় মাহফিল দোলে। মানুষের হৃদয় দোলে। মানুষের মনকে পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসি। আমাকে আবার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যাবে– আকৃষ্ট করে ফেলবে। এ কেমন কথা? এই ভেবে তিনি নবীজীর পেছনে পেছনে তাঁর ঘরে গেলেন। বললেন ঃ আপনি মানুষকে কি বলেন? বলুনতো আমিও শুনি!

রাসূল (সাঃ) তাঁর সামনে দাওয়াত পেশ করলেন। তিনি খুব প্রভাবিত হলেন। সেখানেই কালেমা পড়ে নিলেন। কালেমা পড়ে যখন ফিরে যাচ্ছেন লোকজন তাঁর মুখ দেখেই টের পেল! বুঝল, এও গেছে। তারপর তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলেন। আল্লাহ পাক তাঁর দ্বারা দ্বীনের কত

বড় খেদমত নিয়েছেন। এসবের বিস্তৃত বিবরণ ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থগুলোতে বিধৃত হয়েছে।

সমস্যার সমাধান

এ পথে আঘাতও আসে, সাহায্যও আসে। প্রতিকূলতা, মুজাহাদা, পরীক্ষা ও নির্যাতন আসে একদিকে। অন্যদিকে আসে আল্লাহর সাহায্য। যে কোন অবস্থায় থাকুক, মানুষের কাজ হলো, সংশোধনের পথ অন্বেষণ করা। যদি মানুষ সর্বদাই সাহায্য প্রাপ্তির মধ্যে থাকে তাহলে অবাধ্য ও বেপরোয়া হয়ে যাবে, অনুরূপ সর্বদা প্রতিকূলতার মধ্যে থাকলে ভীত ও নিরাশ হয়ে পড়বে।

সুতরাং সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ হলো– আল্লাহর যিকির করতে থাকা। তিলাওয়াত করতে থাকা। যতটুকু যিকির ও তিলাওয়াত হবে, যে পরিমাণে দু'আ হবে ঠিক সে পরিমাণে-ততটুকুই আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হবে। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে গেলে অনুকূল অবস্থায় বেপরোয়া না হয়ে কৃতজ্ঞ হবে। এর প্রতিকূল অবস্থায় ঘাবড়ে যাবে না, ধৈর্য ধারণ করবে। আর ধৈর্য্য ধারণ করলে আল্লাহর সাহায্য তাদের সাথে থাকবে।

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

'নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।' কৃতজ্ঞতা আদায় করলে আল্লাহ নেয়ামত বাড়িয়ে দেন।

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ

'যদি কৃতজ্ঞতা আদায় কর তাহলে নিশ্চয় বাড়িয়ে দেব।' সুতরাং উভয় অবস্থাতেই উন্নতি হতে থাকবে। যিকির, তিলাওয়াত ও দু'আ অব্যাহত থাকলে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বহাল থাকবে। কষ্টের মধ্যেও আল্লাহ তায়ালা নিকটে থাকবেন। খুব কাছে থাকবেন সুদিনেও।

একরামুল মুসলিমীনের গুরুত্ব

একদিকে কালেমার দাওয়াত অন্যদিকে তা'লীমের হালকা- শিক্ষার আসর। আল্লাহ পাকের যিকির, কুরআনে পাকের তিলাওয়াত এবং দু'আ করা যখন শুরু হবে– যেখানে এক কালেমাওয়ালা বান্দা একা- সে মুনাজাত রত- পুরো সম্প্রদায়ে সে একা; সকল বংশের মধ্যেও সে একা। তার কেউ সঙ্গী নেই। সকলেই তার বিজন। সকলেই তার দুশমন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের

এই একলাপন্থীরা এভাবেই অস্থির হয়, পেরেশান হয়। সকলে একদিকে। সে একা একদিকে। এখন কি করবে সে! আল্লাহ পাক তার ব্যবস্থা এই করেছেন কালেমাপন্থীরা একে অপরের সম্মান করবে– একরাম করবে। সকল কালেমাওয়ালা এক হয়ে যাবে। সংঘবদ্ধ হবে। এটাকেই আমরা 'একরামুল মুসলিমীন' বলি।

একরামুল মুসলিমীন এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্ব

কালেমাওয়ালারা পরস্পরে এটা দেখতে পারবে না সেকি আমার সম্প্রদায়ের না অন্য সম্প্রদায়ের! দেখুন! হযরত বেলাল (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের কারণে তিনি নির্যাতনের শিকার হলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বনূ তামীম গোত্রের অনেক বড় নেতা ছিলেন। তিনি তাকে ক্রয় করে আযাদ করে দিলেন। বংশগত কোন সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক শুধু একটাই। তিনি মুসলমান হয়েছেন। তাই আবু বকর (রাঃ) তাকে একরাম করেছেন– সম্মানে ভূষিত করেছেন। হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ)। তিনি যখন মক্কায় এলেন– যিনি হকের দাওয়াত দিচ্ছেন তাকে দেখার জন্যে। তিনি কে? কেমন তিনি? তিনি এ কথাও জানতেন, তিনি যে এই লোকের (সাঃ) সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন এটা জানা-জানি হলে তাকে মার খেতে হবে। হযরত আলী (রাঃ)- এর সাথে সাক্ষাৎ হলো। তিনি তাকে গোপনে নিয়ে খানা খাওয়ালেন। অথচ বংশগত কোন সম্পর্ক নেই। এভাবেই ৪র্থ নম্বর একরামের মাধ্যমেই মুসলমানদের মধ্যে একতা ও সংঘবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। কালেমাওয়ালাদের মধ্যে যত বেশী একতা ও সংঘবদ্ধতার সৃষ্টি হবে ততোই কাফেরদের মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি হবে।

মুসলমানদের পরস্পর বিবাদের পরিণাম

যারা কালেমাওয়ালা, ঈমানদার তারা যদি সংঘবদ্ধ না হয়ে বিবদমান হয় তাহলে তারা নিজেরাই দুর্বল হয়ে পড়বে। দ্বিতীয়ত, অন্যদের অন্তর থেকেও তাদের প্রতি যে ভয় ছিল তা কেটে যাবে।

فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ

'তোমরা বিবাদে লিপ্ত হলে তোমরা হেরে যাবে এবং তোমাদের শক্তি উবে যাবে।' তাই যারা কালেমাওয়ালা ছিল তারা একে অপরের প্রতি একরাম ও সম্মান করত। পরিণামে তাদের মধ্যে সংঘবদ্ধতা ও একতার সৃষ্টি হয়েছে। যদিও তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন অতীব নগণ্য।

ভাবতে হবে সমগ্র মানবতা নিয়ে

এখন একবার ভাবুন! রাসূল (সাঃ) তো সারা জাহানের নবী হিসেবে আগমন করেছিলেন। তাঁর প্রতিটি উম্মতকে সমগ্র জাহানের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। প্রতিটি উম্মতই সারা জাহানের। সকলের কথা ভাবতে হবে। নিজের কথা, পরিবার, বংশ ও স্বীয় জাতির কথা ভাবতে হবে। কারণ আমরা বিশ্বনবীর উম্মত।

দাওয়াতের পথে খরচ এবং কারগুজারী (রিপোর্ট) সম্পর্কে জরুরী দিক নির্দেশনা

বলার অপেক্ষা রাখে না, যিনি সারা পৃথিবীতে চিন্তা করবেন তার জন্যে তো কিছু আমদানিরও প্রয়োজন হবে। যে কোন কাজেই অর্থের প্রয়োজন হয়। এখানেও আপনি বলবেন, আমিতো যেতে প্রস্তুত। তারপর আপনার কাছে জিজ্ঞেস করা হবে, আপনি কতটুকু খরচ করতে প্রস্তুত। এক বছরের জন্যে গেলে কত ব্যয় করবেন। চার মাসের জন্যে গেলে কত খরচ করবেন।

মুহতারাম বন্ধুগণ!
পয়সাসহই যেহেতু দ্বীনের কাজ করতে হবে তাই জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি চার মাস, এক বছর আল্লার পথে লাগিয়েছ কি?

বিদেশী জামাতের জন্যে তাশকীল

কেউ যদি পঁচিশ বছর পূর্বে চার মাস লাগিয়ে থাকে, তাহলে বিদেশী জামাতের জন্যে তাশকীলকারীরা জিজ্ঞেস করবেন ঃ ভাই আপনি তো পঁচিশ বছর পূর্বে চার মাস লাগিয়েছেন। এমতাবস্থায় তো আপনাকে বিদেশী জামাতে দেয়া যাচ্ছে না। বিদেশী জামাতে আমরা কেবল তাদেরকেই পাঠাই যারা মাকামী কাজ করে। বছরে চিল্লা দেয় অবশ্যই। বাৎসরিক, মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক কাজের নিয়ম মেনে চলে। যেন তার মধ্যে দ্বীনি দাওয়াতের চিন্তা সৃষ্টি হয় এবং মানবতার প্রতি চিন্তা ও নবীদের মত ব্যথার সৃষ্টি হয়।

দুর্বল ব্যক্তিও বিস্ময়কর অবদান রাখতে পারে

নবীদের মত ব্যথা, মানবতার প্রতি দরদমাখা চিন্তা, দ্বীনের ভাবনা যখন সৃষ্টি হয় তখন খুব কম যোগ্য ও সাধারণ লোকের দ্বারাই আল্লাহ তায়ালা বিস্ময়কর কাজ আঞ্জাম দেন।

জামাত অনেক হয়েছে। আমীর নেই। শিক্ষিতরা সব এক জামাতে চলে যাচ্ছে। তাদেরকে যদি বলা হয়, ভাই! দুই দুই জন করে এই বেপড়ুয়াদের সাথে চলে যান। কিন্তু তারা প্রস্তুত নয়। অথচ তাদের তৈরি থাকা দরকার। এদের সাথে গেলে খুব খাটুনী পড়বে। মুজাহাদা হবে। আর এই খাটুনী ও মুজাহাদার মধ্যেই আত্মিক ও রূহানী উৎকর্ষ ও উন্নতি লাভ হবে। এর মাধ্যমে আল্লাহ রাস্তাও খুলে দিবেন।

কিন্তু সাধারণত এই শিক্ষিত লোকেরা এর জন্য প্রস্তুত থাকে না, আল্লাহর মেহেরবানী এখন তৈরি হচ্ছে। শিক্ষিতরা অশিক্ষিতদেরকে নিয়ে জামাতে যাচ্ছে। তারপরও মাঝে মধ্যেই অশিক্ষিত বেপড়ুয়াদের জামাত অনেক বেশী হয়ে যায়।

বেপড়ুয়াদের অনুপম কার্যবিবরণী আজব কারগুজারী

এক জায়গায় বেপড়ুয়াদের জামাত বেশী ছিল। তাদের কেউ-ই বেশী একটা পড়াশোনা জানতনা। বুঝিয়ে সুজিয়ে জামাত পাঠিয়ে দেয়া হল। বলা হল, তোমরাই জামাত নিয়ে যাও। তোমাদের একজনকে আমরা আমীর বানিয়ে দিচ্ছি। তোমরা যেখানে যাবে পড়ুয়া লোক পাবে। পড়ুয়াদেরকে খোশামোদ করে এই কিতাব (ফাযায়েলে আমাল) পড়িয়ে নিবে। তার কাছে নিজের কালেমা-নামায ঠিক করবে। তাদেরকে ছয় নম্বর শোনাবে। এভাবে এখান থেকে একটি বেপড়ুয়াদের জামাত বের হল। তারা শিক্ষিতদেরকে ধরে তাদের কাছে নামায শিখেছে। কিতাব পড়িয়ে শুনেছে, তাদের দ্বারা বয়ানও করিয়েছে। মহল্লার ইমাম সাহেব কখনো দাঁড়ালেই মানুষকে লা'ন-তা'ন বকাবাদ্যি শুরু করে দেয়। মানুষ তার কথা শুনতে অপ্রস্তুত। তারা বলে এর কথাই বলোনা। দাঁড়াতেই বকা-ঝকা শুরু করে দেয়। এদিকে এই বেপড়ুয়াদের সেখানে গিয়ে বিভিন্ন দিক থেকে লোকজন সমবেত করেছে। ইমাম সাহেবকে দিয়ে সূরায়ে ফাতিহা ঠিক করিয়েছে। তাকে দিয়ে কিতাব পড়িয়েছে। তারপর বলল ঃ ইমাম সাহেব হুজুর! আপনিই বয়ান করুন। তবে ছয় নাম্বারের মধ্যে থেকে বয়ান করবেন।

এখন ইমাম সাহেব ছয় নম্বরে বেষ্টিত হয়ে বয়ান করতে দাঁড়িয়েছেন। হাতির মাথায় কাক বসার মত ইমাম সাহেব একটু পরপরই ভাবেন, ছয় নম্বর, থেকে বেরিয়ে পড়ছিনাতো! এভাবে ছয় নম্বরের আওতায় থেকে তিনি

বয়ান শুরু করেছেন। তারপর এক বুড়ো মিয়া দাঁড়িয়ে আরজ করল– ভাই! এই কথাগুলো শেখার জন্যেই আমরা বেরিয়েছি। কিন্তু আমরা পড়া-লেখা জানি না। তোমরা শিক্ষিত মানুষ। আমাদের সাথে চল। যাতে আমরা নামায ঠিক করতে পারি।

এভাবে বুড়ো লোকজন তাশকীল করে ফেলল। ইমাম সাহেবকেও। তিন দিনের জন্যে, কেউ চিল্লার জন্যে এমনটি চারমাসের জামাতও ছিল।

আরেক জায়গার ঘটনা শুনাচ্ছি। এক জায়গায় একটি জামাত গেল। সে এলাকার সকল মানুষই কালেমা ছেড়ে দিয়েছিল। মসজিদের ভেতর ঘোড়া বাঁধা ছিল। জামাত সেখানে গেল। এলাকাবাসী বলল, ভাই! যখন আমাদের কাছে কালেমা ছিল তখনতো তোমরা আস নাই। আমরা যখন কালেমা ছেড়ে দিয়েছি তখন এসেছ। তোমাদের এই আসার অর্থ কি? এবার তাদের অন্তরে পরকালের ভাবনা, দ্বীনের দরদ ও ফিকির সৃষ্টি হলো। জামাতের সকলেই হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। হায়! এই পুরো এলাকা চিরদিনের জন্যে জাহান্নামে যাবে। তারা চিৎকার করে করে কাঁদতে লাগল।

লক্ষ্য করুন! এরা বেশী শিক্ষিত নয়। কিন্তু নবীদের ফিকির দ্বীনের দরদ এদের মধ্যে কত প্রকট। তারা খুব কাঁদল। গ্রামবাসীতো তাজ্জব! আজব কান্ড! ভাই তোমরা কাঁদছ কেন? আমরা তোমাদেরকে খাবার দিচ্ছি! তারা বলল ঃ ভাই খানাতো আমাদের ডেগেই আছে। আরে ভাই, পয়সা লাগলে পয়সাই দেব।' তারা বলল ঃ ভাই আমাদের কাছে পয়সাও আছে। আরে ভাই, শীতের কম্বল না থাকলে কম্বল দিচ্ছি। তারা বলল, ভাই আমাদের কাছে কম্বলও আছে। গ্রামবাসী বলল ঃ তাহলে তোমরা কাঁদছ কেন? দেখুন, কিভাবে প্রভাব পড়ে। মানবতার প্রতি যখন দরদ, চিন্তা ও ব্যথার সৃষ্টি হবে তখন অবশ্যই তার প্রভাব পড়বে। এর প্রভাব না পড়ে পারে না। খালেদ ইব্‌ন ওলীদ কত কঠিন বিরোধী ছিলেন। কিন্তু রাসূলের (সাঃ) চরিত্রের ছোঁয়ার গলে গেছেন। হযরত আমর ইব্‌ন আসের উপর প্রভাব পড়েছে। আবু জাহেলের পুত্র হযরত ইকরিমা (রাঃ)-এর উপর প্রভাব পড়েছে।

মসুলমান হলেন ইকরিমা (রাঃ)

মক্কা যখন বিজয় হলো, আবু জাহেলের পুত্র ইকরিমা (রাঃ) পালিয়ে গেলেন। তার স্ত্রী পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইকরিমা ভাবলেন, মক্কায় থাকাই যাবে না। অন্য কোথাও চলে যেতে হবে। স্ত্রী রাসূল

(সাঃ)-এর দরবারে এসে আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্বামীকে নিরাপত্তা দান করুন। যখন সে নিরাপত্তা, পরিবেশ সুন্দর দেখবে হয়তো বা আল্লাহ তখন তাকে বেহেশ্‌তের পথ দেখিয়ে দেবেন। রাসূল (সাঃ) নিরাপত্তা দিলেন। স্ত্রী তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। ইকরিমা মক্কা থেকে পালিয়ে একদম বাইরে চলে গিয়েছিলেন। তিনি একটি নৌকায় চড়লেন। নৌকা ছেড়েও দিয়েছে। আল্লাহর কারিশমা দেখ! তাঁর নৌকা পানির পাকে নিপতিত হলো। তলিয়ে ডুবে যাবার উপক্রম হলো। মাঝি বলল ঃ নৌকা বাঁচাবার একটিই উপায়– এক আল্লাহকে মান! তিনি একমাত্র বাঁচাতে পারেন। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ!

ইকরিমা বলতে লাগল ঃ আরে এই কালেমার ভয়েই তো পালিয়ে এসেছি। এখানেও সেই কালিমা এসে পৌঁছেছে। ততক্ষণে স্ত্রীকেও দাঁড়ানো দেখতে পেলেন। ইকরিমাতো তাজ্জব! স্ত্রী ইশারা করল ফিরে আসতে। ইকরিমা গলার মধ্যে হাত ছুঁয়ে ইশারা করল ঃ আমাকে মেরে ফেল। কারণ, আমি সারা জীবন এদের বিরুদ্ধে লড়েছি। আমার প্রতিশোধ নেবে। স্ত্রী বলল, তিনি (সাঃ) তোমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। ইকরিমা তখন সঙ্গে চলতে লাগলেন। পথে স্ত্রীকে আদর করতে চাইলেন। স্ত্রী বলল ঃ আমি আদর দেবনা। কারণ, আমি কালেমা পড়েছি, তুমি কালেমা পড়নি। এ কথায় ইকরিমা খুব প্রভাবিত হল।

স্বীয় শত্রুর সাথে নবীজীর আচরণ

তারপর ইকরিমা মক্কায় এলেন। নবীজীর (সাঃ) কাছে পৌঁছলেন। নবীজী সাহাবায়ে কেরামকে বললেনঃ আবু জাহেলের পুত্র ইকরিমা আসছে। তোমরা তার বাবাকে মন্দ বলোনা। কারণ, তার বাপকে গাল পাড়লে তো আর তার বাবার কিছুই হবে না। ছেলে কষ্ট পাবে।

ইকরিমা (রাঃ) যখন নবীজীর দরবারে হাজির হলেন তখন নবীজী গায়ের চাঁদর হেছড়াতে হেছড়াতে তার অভ্যর্থনায় এগিয়ে গেলেন দরজা পর্যন্ত। অথচ এই সেই ইকরিমা যিনি সকল যুদ্ধেই নবীজীর বিরুদ্ধে লড়েছেন। অবিরাম চেষ্টা করেছেন নবীজীকে হত্যা করার জন্যে। আজ তাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে নবীজী এগিয়ে যাচ্ছেন, ইকরিমার হাত ধরে নিজের বিছানায় বসালেন। লজ্জায় শির ইকরিমার। নবীজী তাকে দাওয়াত দিলেন। মুহূর্তে বদলে গেলেন ইকরিমা। মুসলমান হলেন। রাযিয়াল্লাহু আনহু হলেন কালেমা পাঠ করে । আর বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি

যতটুকু সম্পদ ও জীবন ইসলামকে মিটিয়ে ফেলার জন্যে করেছি আজ থেকে তার দ্বিগুণ জীবন ও অর্থ ইসলাম প্রচারের কাজে ব্যয় করব।

চরিত্রের সম্মোহনী শক্তি

ভালো করে মনে রাখতে হবে যে, চরিত্র ও ব্যবহার এক সম্মোহনী শক্তি। এর মাধ্যমে আপনি নিজের ঘরের লোকদের মধ্যেও দ্বীন কায়েম করতে পারেন। এর বলে সহকর্মী বন্ধুদের মধ্যেও একতা সৃষ্টি করতে পারেন। আপনি একজন ব্যবসায়ী। আপনার দোকানে একজন অমুসলিম ক্রেতা এলো। সে আল্লাহকে মানে না। আপনি তার সাথে ভালো ব্যবহার করলেন। মিথ্যা বলেননি। ধোকাও দেননি। ঠকানও নি। খেয়ানত কিংবা মাপে কম দেয়ার মত নীচুতাও দেখাননি। তাকে ভালো ব্যবহার করেছেন। বসতে দিয়েছেন। মিষ্টি ভাষা ও আচরণে তাকে সাদর করেছেন। কারণ, শুধু পয়সা কামানোই আপনার উদ্দেশ্য নয়। আপনার উদ্দেশ্য নবীজীর পবিত্র আদর্শের সম্প্রসারণ ঘটানো।

প্রিয় ভাইয়েরা!

নবী জীবনের প্রতিটি আচরণ এমন যাদুময় যা মানুষের হৃদয় এমনভাবে আকর্ষণ করে চুম্বক যেভাবে লোহাকে আকর্ষণ করে। নবীজীর তরীকার মধ্যেও এই আকর্ষণ রয়েছে। পুরো জীবনে ইসলাম আসার পর আকর্ষণ করব একথা ঠিক নয়। বরং যতটুকু আসবে ততটুকুই অন্যকে আকৃষ্ট করবে।

কান্না অন্যদের জন্যে উপকারে আসে

সম্মানিত বন্ধুগণ!

ভেতরের অস্থিরতা, আন্তরিক ব্যথা বেদনা, চিন্তা-ভাবনা মানুষের অন্তরকে আকর্ষণ করে। এই যে দেখুন! সেই যে কম পড়ুয়াদের জামাত সেই এলাকায় গিয়ে খুব কেঁদেছে। চিৎকার করে কেঁদেছে। লোকজন বলেছে, তোমার খাবার আছে, পয়সা আছে, শীতের কম্বলও আছে। তাহলে তোমরা এত অস্থির কেন? অবশেষে তোমরা কাঁদছো কেন?

তখন জামাতের লোকেরা বললঃ আমরা তোমাদের জন্যে কাঁদছি। তোমরা কালেমা ছেড়ে দিয়েছ। তারা একথা শুনে ভাবল, আরে এরা কেমন সহজ সরল মানুষ এদের সাথে আমাদের ভালো মন্দ কোন সম্পর্ক নেই। অথচ আমাদের জন্যেই তারা কাঁদছে। ঢেকুর তুলে কাঁদছে! আল্লাহ তায়ালা

তাওফীক দিলেন, এলাকার সকলেই তাওবা পড়ে নিল। তাদের দুনিয়াই পাল্টে গেল।

খরচের সমস্যার সমাধান কি?

আমি আরয করেছি, কালেমার দাওয়াত, তা'লীমের হালকা, আল্লাহর যিকির আর দু'আ করতে থাকা। সাথে সাথে অন্যের প্রতি একরাম করা। কিন্তু এর চারটি কাজের প্রত্যেকটির মধ্যেই খরচ আছে শুধু আমদানি নেই। কিন্তু যে কাজ সারা পৃথিবী জুড়ে করতে হলে তার জন্যে আমদানি তো অবশ্যই দরকার! দুই ঘন্টা কালেমার দাওয়াত দিলেতো এক পয়সাও পকেটে আসবে না। দুই ঘন্টা তালীম কর, চার ঘন্টা তিলাওয়াত কর, যিকির কর, দু'আ কর। পকেট হাতড়াও! একটি পয়সাও পকেটে নেই। একরাম করতে গেলে পকেট থেকে আরও বের করতে হয়।

সুতরাং যে কাজে কেবল খরচই খরচ। কোন রকম আয় নেই। তাহলে এই কাজ দুনিয়ায় চলবে কিভাবে! নিজের সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে করতে হবে। নিজের দেশে করতে হবে– সারা পৃথিবী জুড়ে করতে হবে। কিয়ামত পর্যন্ত সকলকে করতে হবে। কেবল ব্যয় আর ব্যয়। আয়ের কোন নাম গন্ধও নেই। এ কাজ পৃথিবীতে চলবে কিভাবে?

আল্লাহর ভান্ডারের চাবি

আল্লাহ পাক রাসূল (সাঃ) কে আকাশে ডেকে নিয়েছেন। সেখানকার সকল ভান্ডার দেখিয়ে দিয়েছেন। এর চাবিও নবীজীর হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। সেই চাবি কি? নামায। তিনি এভাবে বলেছেনঃ যদি তোমাদের কোন প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে নামায পড়। আল্লাহ'র কাছে চাও! এই হলো আল্লাহ'র ভান্ডার। সেখান থেকে গ্রহণের চাবি হলো নামায। নামায পড়। ভান্ডার খুলে নাও। এই নামায নিয়ে তিনি দুনিয়াতে ফিরে আসলেন। এখন যেখানেই কোন কাজ আটকে যাবে আমরা নামায পড়ব। আল্লাহর কাছে প্রয়োজনের কথা বলব।

নামাযকে প্রাণীত করার উপায়

তবে সেই নামায জীবন্ত প্রাণীত হতে হবে। জানদার হতে হবে। কখনো যেন মনে একথা না আসে– নামায পড়ছি, দুআ করছি। কিন্তু কাজতো হচ্ছে না কিছুই। বরং নামাযকে জানদার বানাতে হবে। নামাযকে জীবন্ত জানদার বানাতে হলে নামাযের মধ্যে পাঁচটি জিনিস থাকা দরকার।

১. কালেমাওয়ালা বিশ্বাস।

২. ফাযায়েলের এলম।

৩. মাসায়েলসমৃদ্ধ আকৃতি।

৪. আল্লাহ মুখীধ্যান।

৫. এখলাসপূর্ণ নিয়ত।

নামাযের মধ্যে এই পাঁচটি গুণ থাকতে হবে। কালেমাপূর্ণ বিশ্বাস সৃষ্টি হবে দাওয়াতের পরিবেশ। ফাযায়েলের এলম অর্জন হবে তা'লীমের হালকায়। মাসায়েলসমৃদ্ধ আকুতি অর্জন করতে হবে আলিমগণের কাছে জিজ্ঞেস করে। তিলাওয়াত ও যিকিরের মাধ্যমে হাসিল হবে আল্লাহ মুখীধ্যান। এখলাসপূর্ণ নিয়ত কিভাবে অর্জন হবে এ সম্পর্কে একটু বিস্তারিত বলছি।

এখলাসপূর্ণ নিয়তের শক্তি

আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতারা এসে মক্কায় পাহাড়কে স্বর্ণ বানিয়ে দেবার প্রস্তাব করেছিল নবীজীকে। রাসূল (সাঃ) এটাকে অস্বীকার করেছেন। তিনি জানতেন, পাহাড় যদি স্বর্ণ হয়ে যায়, রূপা কিংবা মনি-মুক্তা হয়ে যায় এবং সোনা-রূপা দিয়ে যদি মানুষকে দ্বীনের কাজ করানো হয় তাহলে মানুষ সোনা-রূপার জন্যে দ্বীনের কাজ করবে। আল্লাহর জন্যে করবে না। আর সোনা-রূপার জন্যে যে দ্বীনের কাজ হয় তার মধ্যে ফেরাউনের সিংহাসন উপড়ে ফেলার ক্ষমতা থাকে না। কায়সার কেসরা ও জালুতের রাজত্ব উৎখাত করার ক্ষমতা থাকে না তাতে। তার মধ্যে শক্তি ও বীর্য থাকে না আবু জাহেলের দলকে কুপোকাত করার। স্বর্ণ-রূপার জন্যে যখন দ্বীনের কাজ হয় তখন তাতে শক্তি থাকে না। এখলাসের সাথে দ্বীনের কাজ না করা হলে তাতে বরকত হয় না যেমনটি পেয়েছিল বনী ইসরাঈলের লোকেরা; যেমন বরকত পেয়েছিলেন হযরাতে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)।

তাই দ্বীনের কাজ স্বর্ণ-রূপার জন্যে না হয়ে শুধুই আল্লাহকে রাজী-খুশি করার জন্যেই হওয়া উচিত। এ কারণেই রাসূল (সাঃ) পাহাড়কে স্বর্ণে রূপান্তরিত করার প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছেন যাতে করে মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে দ্বীনের কাজ করে।

এখলাস সৃষ্টি করার উপায়

এখলাস সৃষ্টি করার উপায় হলো, মানুষ দুনিয়াতে কুরবান করে দ্বীনের কাজ

করবে। তখনই আশা করা যায় এখলাস পয়দা হওয়ার। যদি দ্বীনকে দুনিয়া হাসিলের উপায় হিসাবে গ্রহণ করা হয় তখন সম্ভাবনা আছে ঈমান চলে যাওয়ার।

কারো সাথে আল্লাহর কোন আত্মীয়তা নেই

বনী ইসরাইল পথভ্রষ্ট হয়েছিল। তারা নবীদের সন্তান ছিল। তারা দ্বীনের কাজ করত দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে। ধীরে ধীরে তাদের জীবন থেকে দ্বীন হারিয়ে গিয়েছিল। বাকী ছিল কেবল দুনিয়া।

পক্ষান্তরে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ছিলেন মূর্তিপূজারীদের সন্তান। সাহাবাদের বাপ, দাদা, পরদাদা সকলেই ছিল মূর্তিপূজারী। কিন্তু তারাই যখন আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পথে সকল নির্যাতন কষ্ট মাথা পেতে নিয়েছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যমে বেহেশতে যেতে কৃতসংকল্প হয়েছেন। তারা আরও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আল্লাহর অসন্তুষ্টির পথ বর্জনের, জাহান্নামের পথ পরিহারের। তখনই তাদের যিন্দেগানী হেসে ওঠেছে এখলাসে। নবীজীর কথা মত তারা কাজ করেছেন, তখনই তারা

أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

নিয়ামত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বিশ্বমানবের পথপ্রদর্শক হিসাবে কবুল করেছেন।

প্রতীয়মান হলো, মূর্তিপূজারীর সন্তানরাও যদি সঠিক কাজ করে, আল্লাহকে সন্তুষ্টি করার উদ্দেশ্য করে তারাই দুনিয়ার ইমামের মর্যাদা পান। পক্ষান্তরে নবীদের সন্তানরাও যদি স্বার্থপরতা আর পার্থিবতার লোভে দ্বীনের কাজ করে তখন তার

مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ

এর দলে শামিল হয়ে পড়ে। শামিল হয়ে পড়ে চিরন্তন জাহান্নামীদের কাতারে। আল্লাহ তায়ালা কারও আত্মীয় নন। আল্লাহ তায়ালা লক্ষ্য করেন, কে এক আল্লাহর শক্তিকে স্বীকার করছে: কে এক আল্লাহর ইবাদত করছে।

সবচে' গরীব

নামাযের মধ্যে এখলাস সৃষ্টির জন্যে জরুরী পাঁচটি গুণের কথা বলেছি।

এগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখলে নামায জানদার ও শক্তিশালী হয়। নামায জানদার হওয়ার পর নিজের কাছে যেন বাকী থাকে তার জন্যেও চিন্তা করতে হবে। যদি অন্যের হক নষ্ট করেন তাহলে আপনার বহু মেহনতের দ্বারা বানানো নামায অন্যের হাতে চলে যাবে। কারও অগোচরে নিন্দা করলেন, অপবাদ লাগালেন, অযথাই কাউকে মন্দ বললেন– এসবই বান্দার হক। কেউ যদি এগুলো আদায় না করে তাহলে তার তৈরি ইবাদত যার হক নষ্ট করা হয় তার কাছে চলে যায়। রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে সবচাইকে গরীব কে?

সাহাবায়ে কেয়াম আরয করলেন, যার কাছে অর্থ-কড়ি নেই– সেই! রাসূল (সাঃ) বললেন, না। আমার উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক গরীব ব্যক্তি সেই– যে নেকীর এক বিশাল স্তূপ নিয়ে কিয়ামতের দিন হাজির হবে। কিন্তু লোকেরা এসে বলবে সে আমাকে গালি দিয়েছে। সে আমাকে অপবাদ দিয়েছে, সে আমার জমি দখল করে নিয়েছে। আমার পয়সা চুরি করেছে। তখন সকল নেকী অন্যের হাতে চলে যাবে। তারপর একজন এসে বলবে, হে আল্লাহ! আমিতো রয়ে গেছি। সে আমার প্রচুর গালি দিয়েছে। আল্লাহ বলবেন, তার আয়তো সব শেষ। এখন কী আর করবে। তোমার এতগুলো পাপ এর উপর চাপিয়ে দাও।

এই ব্যক্তি এসেছিল নেকীর বিশাল স্তূপ নিয়ে। এখন সবই অন্যের হাতে চলে গেল। এখন সে অসহায় নিঃস্ব। তাই হুকুকুল ইবাদ বা বান্দার হক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর প্রতি খুব লক্ষ্য রাখা উচিত।

যৌথ সম্পদের প্রতি কঠোর সতর্কতা জরুরী

বিশেষ করে যৌথ সম্পদের ক্ষেত্রে খুব সর্তক থাকা উচিত। এক্ষেত্রে সামান্য অসতর্কতা হয়ে গেলে কঠিন পাকড়াও হতে হবে আল্লাহর দরবারে। তাই এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র গাফেল হওয়ার অবকাশ নেই।

হযরত উমরের সতর্কতার কতিপয় ঘটনা

এ বিষয়ে হযরত উমর (রাঃ) খুব সতর্ক ছিলেন। একবার তদীয় পুত্র একটি উট নিলেন। উটটি মুসলমানদের জমিতে চরতে দিলেন। উটটি মোটা হয়ে ওঠল। জানতে পারলেন উমর। ডেকে পাঠালেন ছেলেকে। বললেন ঃ কত দিয়ে কিনেছ এই উট? দাম বললেন পুত্র। এত দিন কোথায় চড়িয়েছ? উমরের প্রশ্ন! পুত্র উত্তর দিলেন ঃ মুসলমানদের চারণ ভূমিতে।

উমর বললেন ঃ তুমি হাত দিয়ে কিনেছ, ওটা নিয়ে নাও। আর এটা বিক্রি করে অবশিষ্ট অর্থ বায়তুল মালে জমা করে দাও। আর বললেন বাপের কাঁধে চড়ে খাবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে।

একটি ছোট্ট মেয়ে। দুলতে দুলতে এসে হাজির হলো। উমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ মেয়েটি কার? তাঁর ছেলে বললেন, আপনার নাতনি! উমর বললেন, আমার নাতনি! এত দুর্বল, হালকা। ঠিকমত হাঁটতেও পারছে না। ছেলে বললেন, আপনি যে ভাতা দেন তাতে তো এর চে' ভাল খরচ হয় না। তাই এই দশা। ছেলের ইচ্ছা ছিল যে খলীফা ভাতা বাড়িয়ে দেন।

উমর (রাঃ) অস্বীকার করলেন। বললেন, নিজে ব্যবসা কর। নিজেই নিজের খরচের ব্যবস্থা কর। বায়তুল মাল থেকে তো পাবে না। হযরত উমর কতটা সতর্ক ছিলেন। কিয়ামতের কথা সর্বদাই মনে থাকত তাঁর।

আর কথা হলো, আল্লাহ তায়ালা তাঁর অসীম ভান্ডার রাসূল (সাঃ)-কে দেখিয়ে দিয়েছেন। চাবিও দিয়ে দিয়েছেন। সেই চাবি (নামায) জীবন্ত বানাবার উপায়ও বলা হল। নামাযকে নিজের কাছে সংরক্ষিত রাখার জন্যে হুকুকুল ইবাদের ক্ষেত্রে কতটা যত্নবান হওয়া দরকার তাও বলা হল। এর মধ্যেই ছয় নম্বরও এসে পড়েছে। তবে এই সব কাজ মক্কা শরীফে ব্যক্তিগত পর্যায়ে হয়েছে। তারপর রাসূল (সাঃ) যখন মদীনায় গেলেন তখন হয়েছে সংঘবদ্ধভাবে। এভাবেই এই ছয় নম্বরের মাধ্যমে 'ইনশাআল্লাহ' পুরো দ্বীনের উপর চলার শক্তি ও যোগ্যতা অর্জিত হবে আমাদের সকলের।

বদরী সাহায্য কখন আসে?

মদীনায় মুসলমানগণ বিভিন্ন অবস্থার মুখোমুখি হয়েছেন। মুখোমুখি হয়েছেন বদর যুদ্ধের। বদরের পরিস্থিতি আসলে তিনটি কাজ করতে হবে– তবেই বদরী সাহায্য পাওয়া যাবে।

বদরের ময়দানে ইসলামের সকল বিকৃতমনা শত্রুরা এসেছিল। ইসলামকে চিরতরে মিটিয়ে দেয়াই ছিল তাদের অভীষ্ট লক্ষ্য। যেখানে সাহাবায়ে কেরাম তিনটি কাজ করেছেন।

১. ধৈর্য।

২. তাকওয়া।

৩. কান্নাকাটি।

সুতরাং কিয়ামত পর্যন্তের জন্যে নিয়ম জানা হয়ে গেল। যখন চর্তুদিক থেকে বিপদ ঘনিয়ে আসবে তখন ধৈর্য তাকওয়া ও আল্লাহর সমীপে কান্নাকাটির মাধ্যমেই তার মোকাবেলা করতে হবে।

بَلَىٰٓ إِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ـ(پاره/٤ سوره ال عمران)

'হ্যাঁ, তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ কর, আল্লাহকে ভয় কর আর তারা যদি তখনই তোমাদের উপর চড়াও হয়, তাহলে তোমাদের পালনকর্তা চিহ্নিত ঘোড়ার উপর পাঁচ হাজার ফেরেশতা তোমাদের সাহায্যে পাঠাবেন।'

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যখন তাকওয়ার সৃষ্টি হবে তখন আল্লাহর সাহায্য আসবে। তৃতীয় গুণটির বর্ণনা এভাবে এসেছে –

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّىْ مُمِدُّكُمْ ـ

'সেই সাহায্যের দিনকে স্মরণ কর! যে দিন তোমরা কেঁদে সাহায্য প্রার্থনা করছিলে। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রার্থনা কবুল করেছিলেন। এবং বলেছিলেন: আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব।'

আল্লাহর সাহায্য কখন চলে যায়

স্মরণ রেখ, আল্লাহর সাহায্য এসেও আবার চলে যায়। এর কারণ চারটি।

১। পার্থিবতা কামনা করলে। দ্বীনের কর্মীরা যখন দুনিয়া প্রত্যাশী হয়ে পড়ে তখন বেশ কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেমন –

১. মতের দুর্বলা।
২. পরস্পরে দ্বন্দ্ব।
৩. কথা অমান্য করা।

দ্বীনের কর্মীদের মধ্যে যখন এসব বিষয় সৃষ্টি হয় তখন সাহায্য আকাশের দিকে ফিরে যায়। এর কারণে কর্মীরা কাজ ছেড়ে দেয়। যদিও সামান্য অংশই কাজ বর্জন করে তবুও শাস্তি ও নির্যাতন আসলে সকলের উপরই আসে। এমনকি রাসূল (সাঃ)- এর উপরও কষ্ট এসেছে। আঘাত এসেছে।

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗٓ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ (پاره/٤)

আল্লাহর অঙ্গীকার উহুদের ময়দানেও পূরণ হয়েছে। তোমরা অগ্রসর হচ্ছিলে। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কয়েকটি সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে–

حَتّٰى اِذَا فَشِلْتُمْ

তোমাদের রায় যখন দুর্বল হয়ে পড়ল;

وَتَنَازَعْتُمْ

তোমরা আপোসে বিবাদে লিপ্ত হলে,

وَعَصَيْتُمْ

এবং তোমরা কথা অমান্য করলে–

مِنْ بَعْدِ مَا اَرَاكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ

আল্লাহ কর্তৃক তোমাদের প্রিয় জিনিস (বিজয়) তোমাদেরকে দেখানোর পর। (আল-ইমরান) তোমাদের মধ্যে তিনটি সমস্যার সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। কেন সৃষ্টি হলো? এর জবাব এসেছে এভাবে–এবং এটা চতুর্থ কারণ –

مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا

'তোমাদের মধ্যে একদল দুনিয়া প্রত্যাশী হয়ে গেছ।' যদিও এই দুনিয়া হালাল ছিল। মালে গণীমত ছিল।

সাহায্য তুলে নেয়ার লক্ষ্য পরীক্ষা

পার্থিবতার প্রতি লোভ ও দৃষ্টি হৃদয়ের মধ্যে ধূলার সৃষ্টি করে।

مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ (پاره/ ٥)

'তোমাদের মধ্যে একদল দুনিয়া প্রত্যাশী আরেকদল আখেরাত।' সুতরাং একদল ছিল পরকালও আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রত্যাশী। পরিণাম কি হয়েছে ?

ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللّٰهُ ذُوْفَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

'অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে তাদের থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে। তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, আল্লাহ মুমিনদের প্রতি পরম মেহেরবান। অর্থাৎ তিনি যুদ্ধের কায়া বদলে দিয়েছেন। তোমাদের বিজয়কে ফিরিয়ে দিয়েছেন। পরীক্ষায় অবতীর্ণ করেছেন তোমাদেরকে।

কিন্তু এই পঞ্চদশ শতাব্দীর কোন হতভাগা যদি বলে, সাহাবাদেরকে ক্ষমা করব না। আল্লাহ বলছেন, এই শতাব্দীর লোকেরা সাহাবাগণকে ক্ষমা

করুক আর নাই করুক আমি কিন্তু ক্ষমা করে দিয়েছি। কারণ, তাঁরা আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে ক্ষমা চেয়েছেন। কিয়ামত পর্যন্ত আগতব্য সকলের জন্যে এখানে মূলনীতি পেশ করা হয়েছে। সাথে সাথে তারা ক্ষমা চেয়ে পবিত্রও হয়ে গেছেন।

মুহতারাম বন্ধুগণ!

যাদের দৃষ্টি দুনিয়ার দিকে গেছে তাদেরকে দুনিয়ার অন্ধকার ছেয়ে ফেলেছিল । তাদেরকে পরীক্ষায় ফেলে পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। যে ঈমানের উপর আল্লাহর সাহায্য আসবে সেখানে তিনি ধূলো-বালি রাখেন না। পরিচ্ছন্ন করে ফেলেন। এর একটি উদ্দেশ্য এই-

وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا -

'আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে পবিত্র করতে চেয়েছেন।' এখানে প্রশ্ন জাগতে পারে, যারা পরকালের মঙ্গল ও আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রত্যাশী ছিল তাদেরকে এই জাতীয় পরীক্ষায় ফেলা হল কেন? এটা এজন্যে করা হয়েছে যেন তারা আত্মিক উন্নতি ও উৎকর্ষ লাভ করতে পারে। পরকালে যেন মালিক হতে পারে বেহেশতের সুউচ্চ আসনের।

يَأْلَمُوْنَ كَمَا تَأْلَمُوْنَ - وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَالَا يَرْجُوْنَ -

'তারাও তোমাদের মত বড় বড় আশা রাখে। তবে তোমরা আল্লাহর দরবারে যা প্রত্যাশী- তারা তা প্রত্যাশী নয়।'

তাছাড়া এর মধ্যে একটি কল্যাণের দিক এও ছিল যে, কারও মৃত্যুর সময় ও কারণও আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ছিল। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে শাহাদাতের মর্যাদায় ভূষিত করতে চেয়েছেন।

কল্যাণকর আরেকটি দিক ছিল, যখন দ্বীনের কাজ চলে তখন দ্বীনদারদের অনেক কুরবানী দিতে হয়। আর সুযোগ সন্ধানীরা থাকে সুযোগের খোঁজে। তারাও মিশে যায় দ্বীনদারদের সাথে। তখন ভালো-মন্দের পার্থক্য করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। তখন সত্যিকারের প্রেমিকরা অটল থাকে আর সুযোগ পূজারীরা লেজ তুলে পালায়।

مَاكَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ (پاره/٤)

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন ঃ আমি এভাবে মুমিনদেরকে ছেড়ে দিতে পারি না। বরং পরীক্ষায় ফেলি। যেন ভালো-মন্দ আলাদা হয়ে যায়।

এক আকিয়ামত পথ নির্দেশ

প্রিয় নবীজীর পবিত্র জীবন সৌন্দর্য আমাদের সার্বক্ষণিক পথনির্দেশক। প্রতিকূল অবস্থায় কিভাবে আল্লাহর সাহায্য আসে পবিত্র জীবনীতে তার সন্ধান আছে। অধিকন্তু মানুষ কেন প্রতিকূলতার শিকার হয় সেকথাও আছে সেখানে। খন্দক যুদ্ধে তো মুসলমানগণ এক বর্ণনাতীত পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলেন। উপর-নীচ সর্বদিক থেকেই আক্রমণের সংবাদ আসছে–

إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ـ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ـ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ـ

'যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল উচ্চ ভূমি এবং নিম্ন ভূমি থেকে এবং যখন তোমাদের দৃষ্টিভ্রম হচ্ছিল, প্রাণ কণ্ঠাগত হয়েছিল আর তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছিলে– সে সময় মুমিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল, ভীষণভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল এবং মুনাফিক ও যাদের অন্তরে রোগ ছিল তারা বলছিল, আমাদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ ও রাসূলের প্রতিশ্রুতি প্রতারণা বৈ নয়।'

আজ বিশ্বে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে এ অবস্থা নবীজীর যুগেও এসেছিল যেন কিয়ামত পর্যন্ত সকলের জন্যে পথ নির্দেশ হয়ে থাকে। সে জন্যেই ছিল এ ব্যবস্থা। যখন চতুর্দিক থেকে তোমাদের উপর আক্রমণ হবে, দৃষ্টি কপালে ওঠে যাবে, জীবন কণ্ঠাগত হবে, নানা ভাবনা আচ্ছন্ন করে ফেলবে তখন ঈমানদারদের ঈমান ও পরীক্ষায় নিপতিত হবে। প্রকম্পিত হবে তাদের বিশ্বাসের ভিত। আর মুনাফিক ও হৃদবিমারীরা বলবে আল্লাহ ও রাসূল যা বলেছেন সবই ধোকা।

বন্ধুরা!
এই ধরনের কথা রুগ্নমনারাই বলতে পারে। বলতে পারে তারা যাদের মনে দুরভিসন্ধি আছে।

ভয়ানক পরিস্থিতি ও ঈমান দৃঢ় করে

খন্দক যুদ্ধে যখন চতুর্দিক থেকে বিপদ এসেছে তখন মুমিনগণ বলেছেন :

هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ـ

'এর অঙ্গীকার তো আমাদেরকে আল্লাহ ও তদীয় রাসূল পূর্বেই করেছেন। এবং সত্য অঙ্গীকার করেছেন। এতে তাদের কেবল ঈমান ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেয়েছে।'

ঈমানদার দুই প্রকার

ঈমানদারদের মধ্যে দুই প্রকার ছিল। এক প্রকার তো আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করে দেখিয়েছে। আল্লাহর নামে জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছে। যারা রয়ে গেছে তারা অপেক্ষায় আছে আল্লাহর নামে জীবন দানের জন্যে। পরিস্থিতি এদের মধ্যে বিন্দু-বিসর্গ পরিবর্তন আনতে পারেনি। এদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন–

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا

'মুমিনদের এক জামাত অঙ্গীকার পূরণ করে দেখিয়েছে।'

প্রতিকূলতা কেন আসে

আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের প্রতি এই অবস্থা আনেন- যেন সত্যবাদীরা সত্যের বিকাশ ঘটাতে পারে আর মন্দচারীরা পায় হেদায়াত কিংবা চিরন্তন জাহান্নামের পথ।

لِيَجْزِىَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِيْنَ–

'যেন তিনি সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্য কর্মের প্রতিদান দিতে পারেন আর শাস্তি দিতে পারেন মুনাফিকদেরকে।'

আমার ভায়েরা!

সকলেই নিয়ত করুন, যেন আল্লাহ পাক মন্দ লোকদেরকে হেদায়াত দান করেন। যেন আমরা তাদেরকে নিয়ে জান্নাতে যেতে পারি। এই নিয়ত সারা জীবনের জন্যে । নবীজীর অনুপম আচরণ দেখুন। ইকরিমার সাথে তিনি কি ব্যবহার করেছেন। যার ফলশ্রুতিতে আবু জাহিল পরিবারের আশিজন সদস্য দ্বীনের জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছেন। পরিবারের সকলেই জীবন উৎসর্গ করেছেন। কেবল একজন ছেলে আরেক জন কন্যা জীবিত অবস্থায় মদীনায় ফিরে আসেন। হযরত উমর (রাঃ) তখন এই দুই জনের বিয়ে দিয়ে দেন– যেন এই খান্দান খতম না হয়। হারিয়ে না যায়।

মুহতারাম বন্ধুগণ!

আল্লাহর দ্বীনের জন্যে কুরবানী দিতে হবে। দ্বীনের জন্যে কুরবানী না দিলে বাজে কাজে কুরবানী দিতে হবে। অনর্থক পথে জীবন দিতে হবে। তাই সকলেই এই নিয়ত করুন, সারা পৃথিবীতে জামাত পাঠাতে হবে। ইনশা আল্লাহ! ❐

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ ـ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا ـ

বস্তুজগতের ভারসাম্য বজায় থাকলেই পৃথিবীর শৃংখলা বহাল থাকবে

সম্মানিত বন্ধুগণ!

আল্লাহ তায়ালা এই পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনাকে বস্তুজগতের ভারসাম্যের অধীন করে দিয়েছেন। আগুন, পানি, বাতাসের ভারসাম্য বজায় থাকলে এই বস্তুজগতের শৃংখলা বহাল থাকবে। যদি বাতাস একটু দ্রুত চলে তাহলেই সব সর্বনাশ। পানির পরিমাণ বেড়ে গেলেই প্লাবনের রূপ পরিগ্রহ করে বসে। মাটি নড়ে বসলেই ভূমিকম্প। কোন পাহাড় থেকে একটু আগুন বেরিয়ে এলে তো সব ধ্বংস। এই চারটি পদার্থ যদি ভারসাম্য বজায় রাখে তাহলেই দুনিয়ার নেযাম ও শৃংখলা বজায় থাকবে। অন্যথায় নয়।

আত্মিক শৃংখলা ঃ

অনুরূপভাবে আত্মিক শৃংখলা বজায় রাখার জন্যে মানুষের জান-মাল চার কাজে ব্যয় করতে হবে। তাও নিয়মতান্ত্রিকভাবে। মানুষ যদি তার জান-মাল সুনিয়ন্ত্রিতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ পথে এই চার কাজে ব্যয় করে তাহলে আত্মিক জগতের শৃংখলাও বহাল থাকবে স্বকীয় মহিমায়।

আবিশ্ব নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার উপায়

আত্মিক শৃংখলা প্রতিষ্ঠার নিয়ম রাসূল (সা.)-এর সীরত ও সাহাবায়ে কেরামের বরকতময় জীবনীর মধ্যেই খুঁজে দেখতে হবে।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে দু'টি মূলধন দিয়েছেন। শারীরিক শক্তি ও আর্থিক পুঁজি। যদি এই দু'টি জিনিস যথারীতি চারটি কাজে ব্যবহৃত হয় তাহলে বিশ্বময় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে, রাহমাতুললিল আলামীনের সুন্দরতম বিকাশ ঘটবে; শান্তি, নিরাপত্তা ও এই রহমতের হাওয়া প্রবাহিত হবে আগামী হাজার হাজার বছরের অনাগত প্রজন্মকে প্লাবিত করে। যারা বেঁচে থাকবে এই সুন্দর পরিবেশ উপভোগ করবে আর মৃত্যুবরণ করবে যারা তারা পাবে জান্নাতের সন্ধান।

এর জন্যে জান-মালকে পরিমিত ও প্রয়োজন মাফিক ব্যয় করতে হবে।

১. নিজের প্রয়োজনে

২. ইবাদত

৩. চারিত্রিক কাজে

৪. দ্বীনি দাওয়াতে।

অর্থাৎ, দাওয়াত আখলাক ইবাদত ও প্রয়োজন এই চার কাজে মানুষ তার জান-মাল নিয়তান্ত্রিকভাবে ব্যয় করবে।

মানুষের চারটি সম্পর্ক

মানুষের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা চারটি সম্পর্ক রেখেছেন। ১. মানুষের সাথে সাধারণ প্রাণীর জগতের সাথে একটি সম্পর্ক রেখেছেন। ২. ফিরিশতাদের সাথে এক সম্পর্ক। ৩. আল্লাহর খলীফা হওয়ার ভিত্তিতে এক সম্পর্ক আর ৪. নবীর উত্তরাধিকারের এক সম্পর্ক।

চতুর্থ সম্পর্কেরও আবার দু'টি দিক আছে। ১. নবীগণের উত্তরাধিকার। ২. হযরত সায়্যিদুল মুরসালিন (সা.)-এর উত্তরাধিকার।

প্রাণীর সাথে সম্পর্ক

মানুষও আর দশটি প্রাণীর মতই একটি প্রাণী। তাই তার ক্ষুধা লাগে তৃষ্ণা লাগে। তাকে খেতে হয়, পান করতে হয়। যৌন মিলনের চাহিদা হয়, স্বামী-স্ত্রীর মিলন হতে হয়। থাকার জন্যে ঘর-বাড়ির প্রয়োজন হয়। প্রস্রাব-পায়খানা করতে হয়। গরম-ঠাণ্ডায় আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নিতে হয়। শিশুদেরকে লালন পালন করতে হয়। এসব বৈশিষ্ট প্রাণী জগতের সকলের মধ্যেই আছে। এদিক থেকে মানুষের সাথে সাধারণ প্রাণী জগতের একটি গভীর সম্পর্ক আছে। এটাকে আরবী ভাষায় 'হায়ওয়ানিয়্যাত' বলে। হাওয়ান শব্দটি বলতে আমি ভয় পাচ্ছি। এতে করে আবার কেউ মনে করতে পারেন আমাকে জানোয়ার বানিয়ে ফেলল। এ কারণেই আমরা প্রাণী শব্দ ব্যবহার করেছি।

মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য

ক্ষুধা লাগলে আহার করা, পিপাসা লাগলে পান করা এটা সকল প্রাণীরই বৈশিষ্ট্য। মানুষ এর ব্যতিক্রম নয়। অর্থাৎ মানবিক চাহিদা পূরণের অনুমতি আল্লাহ সকলকেই দিয়েছেন। তবে দুটি শর্তের সাথে।

১. প্রথম শর্ত হলো, আল্লাহর আদেশের প্রতি লক্ষ্য রাখা।

২. রাসূলের তরীকার পাবন্দী করা।

এই দু'টি শর্ত সাপেক্ষে খানা-পিনা, স্ত্রী সহবাস, নিবাস তৈরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিবাহ-শাদী সব কিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুমোদিত।

মানুষের মধ্যে এসব চাহিদা আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। সেসব চাহিদা পূরণের অনুমতিও দিয়েছেন। ব্যবধান এতটুকু, জানোয়ারের ক্ষেত্রে কোন শর্ত নেই। মানুষের ক্ষেত্রে দু'টি শর্ত আছে। বিড়াল যেখানেই দুধ পাবে পান করে ফেলবে। এতে তার ভয়ের কিছু নেই। বিড়াল যেখানেই ইদুর পাবে ঘাড় মটকে খাবে। এতে সে অত্যাচারী হবে না। জানোয়ারদের যেখানেই পেশাব-পায়খানার দরকার হয়– সেরে নেয়। তার জন্যে কোন নিয়ম-নীতি নেই। নিয়ম-নীতি শুধু মানুষের ক্ষেত্রে। মানুষ ও জানোয়ারের মধ্যে এটাই পার্থক্য।

ফিরিশতার সাথে সম্পর্ক

মানুষের সাথে ফিরিশতারও একটা সম্পর্ক আছে। যেমন আল্লাহর ইবাদত। অন্য কোন জানোয়ার আল্লাহর ইবাদত করে না। ইবাদত করে মানুষ ও ফিরিশতা।

ফিরিশতাদের সাথে মানুষের এই একটা সম্পর্ক। চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে

রয়েছে জানোয়ারের সাথে সম্পর্ক। সুতরাং মানুষ এখন আল্লাহর ইবাদত করবে, নিজের চাহিদাকে দমন করতে হবে। পক্ষান্তরে ফিরিশতাদের কোন চাহিদা নেই। তাই ইবাদতের ক্ষেত্রে তাদেরকে কোন চাহিদা দমন করতে হয় না; চেপে রাখতে হয়না।

মানুষ মাঝামাঝি ধরনের সৃষ্টি

ক্ষুধা-তৃষ্ণা, পেশাব-পায়খানা, স্ত্রী-সন্তান, বেদনা-ক্লান্তি এসব চাহিদা ফিরিশতাদের নেই। ফিরিশতারা ইবাদত করে স্বাধীনভাবে। তাদের কোন চাহিদা নেই। আর জানোয়াররা কেবল চাহিদা পূরণ করে, তারা ইবাদতে নেই। সুতরাং ফিরিশতারা কেবল ইবাদত করে, তাদের কোন চাহিদা নেই। জানোয়ারগোষ্ঠী কেবল চাহিদা পূরণে ব্যস্ত। তাদের জীবনেও ইবাদত নেই। পক্ষান্তরে মানুষ যখন ইবাদত করে চাহিদা এসে বাধা দেয় তাকে। সে চাহিদার বাধাকে প্রতিহত করে ইবাদতে মগ্ন হয়। তাই মানুষ একটি মাঝামাঝি ধরনের সৃষ্টি।

ফিরিশতা ও মানুষের ইবাদতের পার্থক্য

মানুষের আল্লাহ তাআলা চাহিদাও দিয়েছেন– ইবাদতের আদেশ দিয়েছেন, তাই মানুষ খানা-পিনা ও স্ত্রীর চাহিদাকে দমন করে রোযা রাখে। ঘুমের চাহিদা পদদলিক করে নামায পড়ে। ক্রেতার চাহিদা উপেক্ষা করে আসরের নামায পড়ে। সম্পদের মোহ জয় করে যাকাত আদায় করে। মাতৃভূমির মমতা কুরবানী করে আদায় করে বাইতুল্লাহর হজ্জ। আরাম ও শান্তির চাহিদা উপেক্ষা করে করে হজ্জ। অনুরূপভাবে ইবাদতে সম্প্রসারিত করার জন্যে যদি কেউ দাওয়াতের কাজ করে তাকেও চাহিদাকে পদদলিত করেই করতে হবে। মানুষ ও ফিরিশতার ইবাদতের মধ্যে এটাই পার্থক্য।

মানুষ ইবাদতের উন্নতি সাধনের মাধ্যমে আল্লাহর খলীফা হয়

মানুষ যদি আল্লাহর ইবাদকে ছেড়ে দিয়ে শুধু কামনা ও চাহিদাকেই পূরণ করতে থাকে; ব্যস্ত হয়ে পড়ে খানা-পিনা আর অর্থ উপার্জনে– তাহলে সে জানোয়ার হয়ে যাবে। বরং জানোয়ারের চাইতেও মন্দতর হয়ে পড়বে। কিন্তু এই মানুষই যদি নিজের চাহিদাকে দমনপূর্বক আল্লাহর প্রতি নিবেদিত ইবাদতে শক্তিশালী করে তাহলে মর্যাদায় ফিরিশতাকেও হার মানাতে পারে। সে ভূষিত হতে পারে খোদার খিলাফতে। হতে পারে আল্লাহর খলীফা।

ফিরিশতারা যদি কোটি কোটি বছর আল্লাহর ইবাদত করে তাহলেও আল্লাহর খলীফা হতে পারবেনা। তার মধ্যে খলীফা হওয়ার যোগ্যতাই নেই। অথচ মানুষ ষাট-সত্তুর বছর বয়সেই আল্লাহর খলীফা বনে যায়।

আল্লাহর খলীফা হওয়ার অর্থ

আল্লাহর খলীফা হওয়ার অর্থ হলো, নিজের মধ্যে চরিত্র সৃষ্টি করা। চরিত্র সৃষ্টি করার অর্থ হলো, অন্যদের জীবন গড়ার লক্ষ্যে নিজের জান-মাল কুরবানী করা।

সুতরাং মানুষকে আল্লাহর খলীফা হতে হবে, এ কারণেই তার মধ্যে আল্লাহর গুণাবলীর বিকাশ ঘটতে হবে। আল্লাহ রায্যাক-রিযিকদাতা। সুতরাং তার মধ্যেও এর বিকাশ চাই। ক্ষুধার্থকে অন্ন দেয়া চাই। অন্যকে খাবার দিলেই তার মধ্যে রাযযাকিয়্যাতের প্রকাশ লাভ করবে।

আল্লাহ 'সাত্তার'। তিনি মানুষের দোষ গোপন রাখেন। মানুষকেও এই গুণের প্রতিনিধিত্ব করতে হবে। অন্যের দোষ গোপন করতে হবে। আল্লাহ গাফ্ফার – ক্ষমাশীল। তাই মানুষকেও অন্যের দোষ গোপন করে যেতে হবে। আল্লাহ রহীম – তাই মানুষকেও অন্যদের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে যেতে হবে। দুনিয়াতে অবস্থিত কার্য-কলাপ শুরু হলে জিহাদও করতে হবে। কারণ আল্লাহ কাহ্হার। কারণ, সে আল্লাহর খলীফা। তাই তার মধ্যে এসব গুণাবলী আসতে হবে।

যুদ্ধ-জিহাদ ও চারিত্রিক বিষয়

যুদ্ধ-জিহাদ ও আখলাক বিরোধী কিছু নয়। কারণ, শরীরে যদি বিষাক্ত ফোঁড়া ওঠে তখন ওটা কেটে ফেলে শরীরকে বাঁচানোই বুদ্ধিমত্তার কাজ। এটাই শরীরের প্রতি অনুগ্রহ। অনুরূপভাবে দুনিয়ার মধ্যে যদি আবু জাহিল, আবু লাহাবের মত ফেৎনা-ফ্যাসাদ নাড়া দিয়ে ওঠে তখন এসব ফোঁড়ার অপারেশনপূর্বক আল্লাহর দুনিয়ায় শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠাও খিলাফতের কাজ।

বন্ধুরা আমার!

মানুষের মধ্যে খেলাফতের গুণ যত বৃদ্ধি পাবে সে ততই আখলাক ও চরিত্রবান হবে। আর সেই চরিত্রের ভিত্তিতেই সে জান-মাল খরচ করবে। ক্ষুধার্তকে খাবার দিবে। উলঙ্গকে বস্ত্র দিবে। অবিবাহিতদের বিবাহের ব্যবস্থা করবে। আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দিবে। দুঃখিতদের দুঃখ ঘুচাতে সচেষ্ট হবে।

আখলাক সকলেরই পছন্দ

আখলাক পৃথিবীর সকলেরই পছন্দ। সকলেই অবনত আখলাকের সামনে। এতে মুসলমান অমুসলমানের পার্থক্য নেই।

মুহ্তারাম বন্ধুগণ!

আমি তিনটি কথা বলেছি। ১. প্রাণী হিসেবে মানুষ চাহিদা পূরণ করে।

২. ফিরিশ্‌তার সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে আল্লাহর ইবাদত করে।

৩. আল্লাহর খলীফা হিসাবে আখলাকপূর্ণ আচরণ করে।

'দাওয়াত'
আখলাক ও খিলাফত লাভের উপায়

আমার বন্ধুগণ!

সারা পৃথিবীর সকল মানুষকে জানোয়ারের বলয় থেকে বের করে ইবাদতের মাধ্যমে ফিরিশতাদের কাতারে শামিল করা– অতঃপর ইবাদতের শক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে আখলাকে ভূষিত করা– খিলাফতের মহিমাময় মর্যাদায় ভূষিত করা এটা দাওয়াতের মাধ্যমেই সম্ভব। নবীগণ মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন। পাশবিক শৃংখল থেকে মুক্ত করে ইবাদতের সবুজ উদ্যানে ঠাঁই দিয়েছেন। আখলাকে সুশোভিত করেছেন। খিলাফতের উপযুক্ততায় করেছেন নন্দিত-সজ্জিত।

দাওয়াত নবীদের কাজ
এখন মুসলমানদের কর্তব্য

আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মাধ্যমে নবীদের আসা বন্ধ হয়ে গেছে। তাই এখন কালেমাওয়ালা সকল মুসলমানকেই সেই নবীদের কাজ করে যেতে হবে।

বাজারে গিয়ে যখন মানুষ তার চাহিদা পূরণ করতে থাকবে; হালাল-হারামের তোয়াক্কা না করে যখন আল্লাহর হুকুমকে পদদলিত করবে, সেখান থেকে মানুষকে বের করে আনতে হবে। মসজিদে আনতে হবে। তাদেরকে ইবাদতে শামিল করতে হবে। তা'লীমের হালকায় ধর্মীয় মানসিকতা তৈরী করতে হবে। জামাতে নিয়ে যেতে হবে। চরিত্র ও বেদনার সৃষ্টি করতে হবে। আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াতের জন্যে প্রস্তুত করতে হবে। কারণ, এটা এই উম্মতের কাজ।

মানুষকে দা'ঈ বানানো
নবুওয়ত সমাপ্তিপূর্ণ কাজ

দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষকে পাশবিকতার বলয় থেকে ইবাদতের পথ ধরে ফিরিশতা সম বানিয়ে দেয়া, অতঃপর সেই ইবাদতকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে চরিত্রবান করে তোলা পূর্ববর্তী নবীদের কাজ। কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত (সাঃ)-এর কাজ এরও উর্ধ্বে। আর তা হল চরিত্রবান করে তাকে দ্বীনের দা'ঈতে রূপান্তরিত করা।

নিজে নিজে দা'ঈ হওয়া এটা পূর্ববর্তী নবীদের কাজ। আর অন্যদেরকে দা'ঈ বানানো এটা সর্বশেষ নবীর কাজ– খতমে নবুওয়াতের আমল।

সাথে সাথে নিজের এলাকায় দাওয়াতের কাজ করতে হবে। দ্বীনি দাওয়াতের পরিবেশ তৈরী করতে হবে। তা'লীমের হালকার ব্যবস্থা করতে হবে। যিকির, তেলাওয়াত-এর পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। গাশ্‌ত করতে হবে। ঘরে ঘরে গিয়ে দাওয়াত দিতে হবে। প্রতিটি ঘরে তা'লীমের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রত্যেক ঘর থেকে এক একজন করে আল্লাহর রাস্তায় বের করে আনতে হবে। মসজিদে গিয়ে এলাকার লোকদের মধ্যে কাজ করতে হবে। এসবই নবীদের কাজ। সকল নবীই তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় কাজ করেছেন।

হযরত মূসা (আ.) মিশরে কাজ করেছেন। হযরত শুআইব (আ.) মাদায়েনে দ্বীনি দাওয়াত প্রচার করেছেন।

বিশ্বময় দ্বীনি দাওয়াতের চিন্তা করা শেষ নবীর কাজ

নিজ এলাকায় দাওয়াতের কাজ করা এটা অন্যান্য সকল নবীর কাজ। কিন্তু সারা পৃথিবীর চিন্তা মাথায় নিয়ে কাজ করা এটা সায়্যিদুল মুরসালিন (সা.)-এর কাজ। সারা পৃথিবীতে দ্বীন পৌঁছাবার চেষ্টা করা, নিজের এলাকা থেকে জামাত তৈরি করে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়া এটা নবীজীর (সা.) কাজ। আমাদের রাসূল (সা.) এলাকায়ও কাজ করেছেন অন্যান্য নবীদের মত আবার সারা পৃথিবীরও ফিকির করেছেন। কিভাবে দা'ঈ তৈরী করা যায় সেজন্যে পরিবেশ তৈরী করেছেন; সে পরিবেশকে কাজে লাগিয়েছেন।

পরিবেশের ফসল

রাসূল (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের (রা.) পরিবেশ তৈরী করেছেন। যার ফলে মদীনায় এসে পূত পবিত্র অনেক দাওয়াতের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। সে পরিবেশের বদৌলতে চরিত্রের সৃষ্টি হয়েছে। ইবাদতে শক্তির সঞ্চার হয়েছে। তখন চাহিদা পূরণ করা প্রয়োজনের পর্যায়ে চলে গেছে। সীমালংঘনের পর্যায়ে থাকেনি। অথচ চাহিদা সীমালংঘনের পর্যায়ে ছিল। প্রয়োজনের বেশী খানা-পিনা, ঘর-বাড়ি তৈরি করা সীমালংঘনের শামিল।

اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيْلًا

'তারা তো কেবল চতুস্পদ জন্তুর মত। বরং তারো চাইতে অধিক উদভ্রান্ত'

রাসূল (সা.)-এর প্রথম কাজ

রাসূল (সা.)-এর সীরাত অধ্যয়ন করলে প্রতিভাত হয়ে ওঠে, তিনি (সা.) সর্বপ্রথম দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে একীনপূর্ণ কালেমা ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস সৃষ্টি করতে মেহনত করেছেন। মানুষের ঈমানকে শক্তিশালী করার জন্য মানুষের ঘরে ঘরে যাওয়া, কালেমার দাওয়াত নিয়ে হাজির হওয়া এটাই রাসূল (সা.)-এর পহেলা কাম। রাসূল (সা.) তদীয় সাহাবাগণকে দিয়েও এ কাজ করিয়েছেন। সকল নবীই করেছেন এ কাজ।

দাওয়াত থেকে খেলাফত

দাওয়াতের দ্বারা ঈমান দৃঢ় হয়। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। আল্লাহর নিয়ম-কানুন সম্পর্কে ধারণা হয়। ইবাদতে শক্তি সঞ্চার হয়। তখনই ইবাদত মানুষকে চরিত্রবান করে তুলে।

দাওয়াতের কাজ না হলে ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে। আল্লাহর ভয় চলে যায়। ইবাদতের প্রতি আকর্ষণ থাকে না। ইবাদত করলেও তা হয় খুবই দুর্বল। এই ইবাদত তার মধ্যে আখলাক আনতে পারে না। দেখা যায়, একদিকে নামায পড়ছে অন্যদিকে ঘুষ নিচ্ছে। হজ্বও করছে, অন্যের জায়গা-জমিও দখল করছে। রোযাও রাখছে, মানুষের সাথে ঝগড়া-ঝাটিও করছে।

কারণ, ইবাদত তাকে চরিত্রবান বানাতে পারেনি। কারণ, তার ঈমান দুর্বল, ঈমান দুর্বল হওয়ার কারণ হলো, সে দাওয়াতের পরিবেশ পায়নি।

দাওয়াতের পরিবেশেই ঈমান শক্তি পায়। ঈমানের শক্তিতে ইবাদত প্রাণীত হয়। প্রাণীত ইবাদত আল্লাহর সাথে সম্পর্কের সেতু গড়ে তুলে। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক হলেই খিলাফতের উপযুক্ত হয়।

কাচারী আর জেলখানায় চরিত্র নেই

চরিত্রের উৎস ইবাদত। শুধু আদালত প্রতিষ্ঠা করলে, কাচারী বানালে আর জেলখানা গড়ে তুললেই আখলাক প্রতিষ্ঠা পায়না। বরং এসবের কারণে আখলাক চরিত্র আরও পতিত হচ্ছে। আখলাকের উৎস তো হলো ইবাদত।

মানুষ যখন দাওয়াত ছেড়ে দিয়েছে তখন তাদের ঈমান দুর্বল হয়ে পড়েছে, পরকালের ভাবনা লোপ পেয়ে বসেছে। পার্থিবতার গুরুত্ব বেড়ে গেছে। সম্পদই জীবনের ভিত্তি বলে মনে হতে শুরু করেছে। ইবাদতের মধ্যে সম্পদ অর্জনের ধান্দা এসে পড়েছে। ইবাদতও ছুটতে শুরু করেছে। করলেও নিষ্প্রাণ ইবাদত। সম্পদের কারণে তো আর চরিত্র গঠন হয় না। তাই ধীরে ধীরে মানুষের মধ্যে

পাশবিকতার সৃষ্টি হয়েছে, আর সেই পাশবিকতা সারা পৃথিবীর শৃঙ্খলাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়েছে।

মানুষ যখন তার যাবতীয় শক্তি খানা-পিনা আর অর্থ উপার্জনের নেশায় বিলাতে থাকে, ইবাদত ও চরিত্রের জন্যে যখন সে কিছুই বিলায় না তখন সে জানোয়ারের চাইতেও অধম বলে বিবেচিত হয়।

জানোয়ার তিন প্রকার

জানোয়ার তিন প্রকার। এক প্রকার জানোয়ার আছে যারা শুধু নিজের বাসনা পূরণ করে যায়। কারও ক্ষতি করে না। যেমন কবুতর ও অন্যান্য পাখি। ক্ষুধা লাগল। দু'টো দানা তুলে নিয়ে চলে গেল। মানুষের মধ্যেও যখন পশু স্বভাব এসে পড়ে সেও কানা-পিনা সংগ্রহ, ঘর-বাড়ি নির্মাণ, বিয়ে-শাদী সম্পাদন ইত্যাকার আত্মবাসনায় হারিয়ে যায়। অন্যের প্রতি কোন লক্ষ থাকে না।

মানুষ প্রথমে কবুতরের মত জানোয়ার হয়। যদি এই সময় সে চিকিৎসা না করে তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর জানোয়ারে রূপান্তরিত হয়। এটা খুব ভয়ানক পর্যায়। সে তখন অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে নিজের বাসনা পূরণ করে। এ পর্যায়ে পতিত হবার পর মানুষ চুরি-ডাকাতি করে ঘুষ নেয়, ভেজাল করে, মিথ্যা বলে, ধোকা দেয়, খেয়ানত করে।

এই পর্যায়ে পতিত হবার পরও যদি সে চিকিৎসা না করায়, সম্বিত ফিরে না পায়, সংযত না হয় তখন তৃতীয় স্তরে পতিত হয়। তখন সে নিজের ফায়দা হোক না হোক অন্যের ক্ষতি করতে থাকে। সাপ-বিচ্ছুর মত। সাপ যাকে দংশন করে সে কষ্ট পায় বটে কিন্তু সাপের পেট ভরে না। সে বিন্দুমাত্রও উপকৃত হয় না, অথচ তার আঘাতে একটি প্রাণ ঝরে পড়ল তারই সামনে, মানুষ যখন এই স্তরে নেমে আসে তখন সে হিংসা, বিদ্বেষ, কপটতায় আক্রান্ত হয়। তখন সে কেবল অন্যের ক্ষতি সাধনে ব্যস্ত থাকে। এতে তার কোন ফায়দা হোক বা না হোক।

জানোয়ারের চেয়েও মন্দতর

এই পৃথিবীতেই মানুষ যখন এই তিন শ্রেণীর জানোয়ারের স্তরে নেমে আসে তখন তারা পরস্পরে ঝগড়া-ঝাটি করতে থাকে যেভাবে কুকুরে কুকুরে লেগেই থাকে। শিংধারী বকরী শিংহীন বকরীকে আঘাত যেভাবে করে, মানুষও সেভাবে অসহায়কে আঘাত করতে থাকে। তখন সে পশুর চাইতেও মন্দতর হয়ে যায়। কারণ, তারা তখন সংঘবদ্ধ হয়ে লড়াই করে। জানোয়াররা কখনো সংঘবদ্ধ হয়ে লড়েছে শোনা যায়নি– কিন্তু মানুষ প্রতিনিয়তই এ কাণ্ড করছে।

পশুত্ব আর খেলাফতের পার্থক্য

খানা-পিনা নিজে করা এটা একটা পাশবিক গুণ। কিন্তু অন্যের জন্যে খানা-পিনার ব্যবস্থা করা, অন্যের মুখে খাবার তুলে দেয়া এটা হলো নিজের জন্যে ঘর-বাড়ি তৈরী করা এটা পশুর গুণ। আর অন্যের জন্যে ঘর-বাড়ি তৈরী করা এটা খেলাফতের বৈশিষ্ট্য। আজ বিশ্বময় মানবগোষ্ঠীসমূহ পাশবিক বৈশিষ্ট্য পালনেই আকণ্ঠ ডুবে আছে। খিলাফতের সকল গুণাবলী তারা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছে।

মানব বৈশিষ্ট্য ও তার মর্যাদা

উদর পূর্তি করা কোন মানুষের বৈশিষ্ট্য নয়। বেশী খাওয়া যদি কোন বৈশিষ্ট্য হতো, বিশেষ কোন মর্যাদার বিষয় হতো তাহলে হাতি হতো সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদাবান প্রাণী। সুউচ্চ ঘর তৈরী যদি কোন মর্যাদার কারণ হতো তাহলে পাখিই হতো মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত। বাবুই পাখির বাসাতো গাছের সর্বোচ্চ ডালে! মাটির তলে আণ্ডার গ্রাউণ্ড গৃহ তৈরি যদি কোন মর্যাদা ও গর্বের বিষয় হতো তাহলে ইঁদুর থাকতো মর্যাদার শীর্ষে।

বিদ্যুত নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার কোন মর্যাদার বিষয় নয়

মানুষের মধ্যে যদি ইবাদত, আখলাক ও দাওয়াতের নির্মল গুণাবলীর উপস্থিতি না থাকে তাহলে বৈদ্যুতিক নৈপুণ্য, বিদ্যুত নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার করাটা মানুষের জন্যে কোন মর্যাদা ও অহংকারের বিষয় নয়। কারণ, এই গুণ পাখির মধ্যেও আছে। 'বয়া' নামে একটি পাখি আছে। তারা তাদের বাসার মধ্যে জোনাকী আটকে রেখে বিদ্যুতের কাজ চালায়। তাই শুধুই বিদ্যুত নিয়ন্ত্রণ কোন মানুষের জন্যে মর্যাদার বিষয় হতে পারে না। হ্যাঁ, যদি এই বিদ্যুত নিয়ন্ত্রনেণর পাশাপাথি তার মধ্যে ইবাদত আখলাক ও দাওয়াতের আলো থাকে তাহলে বিদ্যুত নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহারটাও তার জন্যে একটি বৈশিষ্ট্যের বিষয়। এই তিনটি গুণ যদি মানুষের মধ্যে না থাকে তাহলে অন্য কোন বৈশিষ্ট্যই তাকে মর্যাদাবান করতে পারবে না।

কেবল চিকিৎসক হওয়া কোন মর্যাদার কথা নয়

সম্মানিত হাজিরীন!

মানুষের মধ্যে যদি উল্লিখিত এই তিনটি গুণ না থাকে তাহলে শুধু ডাক্তার হওয়াটাও তার জন্যে কোন মর্যাদার বিষয় নয়। একবারে একটি ঘটনা!

বানরের উৎপাতে লোকজন খুব অস্থির হয়ে পড়েছেন। জীবনযাত্রা ব্যহত

হওয়ার মত অবস্থা। তখন তারা একটি ফন্দি আঁটল। তারা কিছু রুটির মধ্যে বিষ মিশিয়ে ছাদের উপর ছড়িয়ে দিল। যথা সময়ে বানর এলো। খাবারের সামনে এসে নাক লাগিয়ে নীরিক্ষা করল, তাতে সমস্যা আছে। চলে গেল। কিছুক্ষণ পর ফিরে এলো বাহিনী। সকলের মুখেই কি যেন এক গাছের ডালা। অদ্ভুত কাণ্ড! গাছের ডালা চুষে খাচ্ছে আর রুটি সাবার করে যাচ্ছে গোগ্রাসে। রুটি শেষ। কিন্তু মরেনি একটি বানরও। প্রমাণিত হলো ডাক্তারী কিছুটা বানরও জানে। তাই শুধু ডাক্তারী কোন গর্বের বিষয় নয়। হ্যাঁ, ডাক্তারীর সাথে যদি ইবাদত, আখলাখ ও দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য থাকে তাহলে সে ডাক্তারীও বিরাট গর্বের বিষয়।

প্রশাসনও মানুষের বিশেষ বৈশিষ্ট্য নয়

দেশ শাসন করা, মানুষের উপর রাজত্ব করাটাও বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য নয়। হ্যাঁ, যদি উল্লেখিত তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকে অতঃপর শাসন ক্ষমতা যোগ হয় তাহলে নিশ্চয় সেটা গর্বের বিষয়, অন্যথায় শুধুই শাসন পরিচালনার বৈশিষ্ট্য পশুর মধ্যেও আছে। পশুবিদ্যা সম্পর্কে ধারণা থাকলে আপনারা বুঝবেন, এই যে মধু পোকা! ওদের মধ্যে একজন রানী থাকে। তার পেছনে অন্যসব মৌমাছি ছুটে বেড়ায়। সে নির্ধারিত ফুলের মধু আহরণের কাজে তাদেরকে নির্দেশ দেয়। তার নির্দেশ মাফিক সকলেই মধু সংগ্রহে নেমে পড়ে। বিন্দু বিন্দু মধু আহরণে গড়ে তোলে বিশাল মৌচাক। রানীর নেতৃত্বে। কেউ যদি তার নির্দেশ পালনে ভুল করে, অনির্দেশিত ফুল থেকে মধু আহরণ করে তাকে শাস্তি দেয়ার জন্যে 'জল্লাদ' নিযুক্ত করা আছে। জল্লাদ অবাধ্য মৌমাছিটিকে মুহূর্তে খতম করে ফেলে।

নির্বাচনী লড়াই কোন বিষয় নয়

মানুষের মধ্যে যদি ইবাদত, আখলাক আর দাওয়াতের আলো না থাকে তাহলে নির্বাচন করা, ক্ষমতা লাভ করা কোন গর্ব ও মর্যাদার বিষয় নয়। কারণ, পশু জাতির মধ্যেও নির্বাচনী বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। ধরুন, এক জায়গায় একটি মোরগ আছে আর মুরগী আছে পঁচিশটি। তাহলে সেখানে কোন যুদ্ধ নেই। লড়াই নেই। কিন্তু যদি একটি মোরগ এসে পড়ে দেখবেন, দুই মোরগের মধ্যে লড়াই বেঁধে গেছে। যথারীতি যুদ্ধ। হার-জিতের যুদ্ধ। তাদের সে যুদ্ধ খানা-পিনার যুদ্ধ নয়। জায়গা-জমির যুদ্ধ নয়। বাড়ি-ঘরের যুদ্ধ নয়। বউ-বেটীর যুদ্ধ নয়। এ যুদ্ধ মুরগীদের নেতৃত্বের যুদ্ধ। উভয় মোরগ জীবনের শেষ শক্তিটুকু দিয়ে প্রমাণ করতে চায় মুরগীদের নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্য আমি। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়।

লড়াই বড়ত্বের

বিজয়ী মোরগের তিন কাজ লক্ষণীয়! ১. সে বুক টান করে হাঁটে। ২. পাখা চাপড়ে উল্লাস প্রকাশ করে। ৩. আর গর্ব ও অহংকারে যেন মাটিতে তার পা পড়ে না। এই দৃশ্য আমি বার বার দেখেছি। নিজের চোখে দেখেছি। সে যেন একথা বলে যায়, এই পরাজিত মোরগ আমার অধীনস্থ। সে আমার ঘরে যেতে পারবে না। খেতে হলে গোপনে গোপনে খাবে। কোন মুরগীকে ব্যবহার করতে হলে করবে নিতান্ত আমার দৃষ্টির আড়ালে। যদি তার চোখের সামনে পরাজিত মোরগ কোন মোরগীর পিঠে ওঠে বসে তাহলে দু ঘা বসিয়ে দিয়ে স্মরণ করিয়ে দেয় তার সেই পুরনো পরাজয়ের কথা। এই সত্যও আমি স্বচক্ষে অবলোকন করেছি।

এই মোরগটি ভাবে এই পরিবারের প্রধান আমি। অথচ বড় সে নয়। বড় ঘরের মালিক। তারও মালিক। হতে পারে, সে বিজয় উল্লাসে। অথচ ঘরে মেহমান এসেছে, তাকে জবাই করে একটু পরেই অতিথিদের সামনে পরিবেশন করা হবে।

আল্লাহ সবার বড়

মানুষ মনে করে, আমি বিপুল ভোট পেয়েছি, সুতরাং আমার চে' বড় আর কে আছে? অথচ মিনারা থেকে নিয়তই আওয়াজ আসছে, 'আল্লাহু আকবার' আল্লাহ সবার বড়। মূলতঃ আল্লাহই বড়। যখন সময় হবে সুইচ টিপে দেবেন। আর তুমি বড় (?) মিয়ার সেখানেই যবনিকাপাত! জীবনের সমাপ্তি। সুতরাং মানুষের কি দাম আছে?

পরাশক্তিধরও নিজের জীবন বাঁচাতে পারে না

প্রিয় বন্ধুরা!

আজ বিশ্বময় আওয়াজ ওঠেছে একটি শক্তির। পারমাণবিক যন্ত্রের ঝনঝন নিতে বিশ্ব আজ প্রকম্পিত, আন্দোলিত!

ত্রিশ বছর আগের কথা! ত্রিশটি দেশ মিলে একটি শান্তি চুক্তি করেছিল। তাদের চুক্তি ছিল পারমাণবিক অস্ত্রের মালিক একটি দেশের সাথে। সে দেশের প্রেসিডেন্টের শক্তির শেষ নেই। পারমাণবিক শক্তি! সহজ কথা? এখন চুক্তিবদ্ধ ত্রিশটি দেশই গর্ব করে আমাদের সাথে পারমাণবিক শক্তি রয়েছে। বিশ্ব তাদেরকে ভয় পায়।

একদিনের ঘটনা। সাদা-কালোর মধ্যে বিরোধ বেঁধে গেল। রেডিও-টেলিভিশনে খবর ছড়িয়ে পড়ল। তাদেরকে সামলাতে হয়। এক করতে

হয়। এটা পারমাণবিক শক্তির অধিকারী প্রেসিডেন্টের কাজ। তিনিও যথারীতি প্রস্তুত। ভবন থেকে বের হলে সামনে পাঁচটি মোটর পেছনে পাঁচটি মোটর। একই রঙের। একই ধরনের। যেন কেউ ধরতে না পারে কোনটিতে প্রেসিডেন্ট! আকস্মিকভাবে চলন্ত মোটরে এসে একটি গুলি লাগল। আক্রান্ত হলেন প্রেসিডেন্ট। পানি পান করারও সময় পেলেন না। ওখানেই কিস্সা খতম।

আল্লাহ তাআলা দেখিয়ে দিলেন, তুমি পারমাণবিক অস্ত্র দেখিয়ে তো ত্রিশটি দেশ হেফাযত করে ফেলেছ। কিন্তু যখন আল্লাহর পাকড়াও এসে পড়েছে তখন তোমার বিশাল পারমাণবিক অস্ত্রের বলে পিস্তলের একটি গুলিও ঠেকাতে পারলে না।

তাই আল্লাহর শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ কর। আল্লাহর শক্তিকে মেনে নাও। আল্লাহর শক্তিকে অস্বীকার করলে ডুবে মরতে হবে। এটাই নবীদের দাওয়াত। একথাই তারা বলে গেছেন যুগে যুগে।

বিজ্ঞানী আর গবেষকরা ভুলে যায় নিজেদের কথা

সম্মানিত বন্ধুগণ!

এসব পাশবিক গুণাবলী যদি মানুষের মধ্যেও সৃষ্টি হয়, মানুষও যদি পশুর মতোই খানা-পিনা, ঘর-বাড়ি, অস্ত্র ও লড়াই আর ডাক্তারীতে আকণ্ঠ ডুবে থাকে তাহলে তাদের মধ্যে আর ইবাদত, আখলাক এবং দাওয়াতের গুণাবলী সৃষ্টি হবে না।

তখন মানুষপশুতে কোন ভেদাভেদ থাকবেনা। পশুর মতোই পরস্পরে লড়াই যুদ্ধে মেতে থাকবে। একে অপরের রক্তে গোসল করবে। ফ্যাসাদের ঝড় ওঠবে। মানুষ হয়ে পড়বে অর্থহীন, মূল্যহীন। যেমন আজকের বিশেষ মানুষের কোন দাম নেই। অথচ এই মানুষকে আল্লাহ তাআলা এত দামী এবং সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছিলেন যে, ফিরিশতা দিয়ে তাকে সিজদা করিয়েছেন।

মানুষ পায়খানা থেকে শুরু করে চাঁদ পর্যন্ত আবিষ্কার করেছে। অণূ-পরামানু নিয়ে গবেষণা করেছে। গবেষণা করেনি নিজেকে নিয়ে। আবিষ্কার করেনি নিজের সত্তাকে। চিকিৎসকরা পায়খানা নিয়ে গবেষণা আর বিজ্ঞানীরা গবেষণা করেছে চাঁদ ও চাঁদের দেশ নিয়ে। ভাবেনি কেবল নিজেদের কথা। নিজেদের জীবনের কথা।

পৃথিবীতে এখন মূল্যহীন শুধু মানুষ

পরিণামে মানুষ আজ মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। আজ ঘর-বাড়ি নিয়ে ঝগড়া বাধলে মানুষ খুন হয়। দোকান নিয়ে লড়াই হলে মানুষ খুন হয়। জমি নিয়ে যুদ্ধ

দ্বন্দ্ব হলে মানুষ মারা যায়। অস্ত্র বিক্রির জন্যে মানুষ মারা হয়। যেন মানুষের কোন কানা-কড়ি দাম নেই।

জন্ম নিয়ন্ত্রণও মানুষের অবমূল্যায়ন

আজ সকল পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু হলো, যাতে পৃথিবীতে মানুষ না আসতে পারে। দু'বাচ্চা হলেই যথেষ্ট। তিনটি হয়ে গেলে আর বাচ্চা নেয়ার কোন ক্রমেই দরকার নেই। এসব শ্লোগান মানব প্রজনন বন্ধের জন্যে। অথচ এমন কোন প্লান নেই, এমন বৃক্ষরোপণ করা যাতে কেবল দু'টি বা তিনটি ফল ধরবে। এমন ক্ষেত করা হোক যাতে কেবল তিন মণ গম হবে। এই নিয়ে কোন আইন নেই। আইন কেবল মানব প্রজনন বন্ধ করা নিয়ে। মানুষ নিয়ে আইন হয়েছে, দুই বা তিনের বেশী আসতে পারবে না। যাতে অন্যেরা সুখে থাকতে পারে।

সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায়, মানুষের মূল্য আজ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষের চাইতে কম দামীও কি কিছু আছে? সত্যিই মানুষের কোন দাম নেই। কারণ, মানুষ নিজেই তার মূল্য হারিয়ে ফেলেছে। অথচ এই মানুষকেই আল্লাহ তায়ালা ফিরিশতার উপরে মর্যাদা দান করেছিলেন।

আল্লাহও এখন মানুষের সাথে পশুসুলভ আচরণ শুরু করেছেন

মানুষ যখন মানবতাকে ঝেড়ে ফেলেছে, ছেড়ে দিয়েছে মানবসুলভ সকল আচার-আচরণ, তখন আল্লাহ তাআলাও মানুষের সাথে পশুর মত আচরণ করতে শুরু করেছেন। তাইতো তিনি মাঝে মধ্যে ভূমিকম্পের সৃষ্টি করেন। লাখ লাখ মানুষ নিঃশেষ হয়ে যায়। ঝড় আসে, তুফান আসে। অগণিত মানুষ মারা যায়। বন্যায় মারা যায় কত তার হিসাব-ই বা কে রাখে?

মেট্রিকোর ভূমিকম্পকে পারমাণবিক অস্ত্র দিয়ে ঠেকানো যায়নি। হাংগেরী ঝড়-তুফানকে কোন রাসায়নিক অস্ত্র দিয়ে ফেরানো যায়নি। দক্ষিণ ভারতের বন্যাকেও প্রতিহত করা যায়নি কোন আধুনিক অস্ত্রের বলে। এক একটি দুর্ঘটনায় এত মানুষ মারা যায় যে, লাশ দাফন করার যথেষ্ট লোকও পাওয়া যায় না। অথচ এসবের যেন আজ কোন বিশেষ মূল্য নেই। সবকিছুই যেন গা সওয়া হয়ে গেছে। যেমন, একটি ঝড়ে কতগুলো পাখি মরল, কতগুলো পাখির বাসা ধ্বংস হলো এর যেমন কোন খবর রাখে না কেউ, কোন পত্রিকায় যেমন এর কোন পরিসংখ্যান ছাপা হয় না আল্লাহ তায়ালার দরবারে এই মানবতাহীন মানবের মৃত্যু বিশেষ কোন গুরুত্ব পায় না। তারা মারা যাওয়ার ছিল, মারা গেছে। জাহান্নামে গেছে। আল্লাহ তায়ালা এদের কোন খবর রাখেন না।

নামাযীর সম্পর্ক সপ্তাকাশের সাথে

রাসূল (সা.) মানুষকেই সংশোধনের পথ বাতলে দিয়েছেন। তাদের ভেতর থেকে বিনাশী সকল অন্যায় বোধ পরিচ্ছন্ন করে তাদের মধ্যে ভস্ম ও সুন্দর গুণাবলী সৃষ্টির পথ বলে দিয়েছেন। তিনি মানুষের জান-মাল খরচ করার চারটি কাজ বলে দিয়েছেন। চারটি কাজ হলো ১. ইবাদত, ২. আখলাক, ৩. দাওয়াত। এই তিন কাজে খরচ হওয়ার পর অবশিষ্ট যা থাকবে তা ব্যয়িত হবে নিজের প্রয়োজনে।

এসব গুণাবলী যদি কোন মানুষ অর্জন করতে পারে তাহলে তার জীবন দামী ও মূল্যবান হয়ে ওঠবে।

আমরা যখন ইবাদত করব তখন ফিরিশতার সঙ্গ পাব। নামাযের মধ্যে ফিরিশতা থাকেন। এক আসমানে ফিরিশতারা রুকু করে আরেক আকাশে করে সিজদা, আরেক আকাশে দাঁড়ায়, কিয়াম করে, কু'দাও উপবেশন করে ভিন্ন আকাশে। মানুষ যখন নামাযের বিভিন্ন 'রুক্ন' আদায়ে মশগুল হয় তখন একেকবার তার সম্পর্ক একেক আকাশের সাথে হয়। কখনও চতুর্থ আকাশের সাথে, কখনও পঞ্চম আকাশের সাথে, কখনও বা সপ্তম আকাশের সাথে। সম্পর্ক হয় তার ফিরিশতার সাথে।

ইবাদতে ফিরিশতার সঙ্গলাভ

যখন কোথাও তা'লীমের হালকা বসে ফিরিশতারা তাদেরকে বেষ্টন করে রাখে। কেথাও দ্বীনি বয়ান হলে মাটি থেকে আসমান পর্যন্ত ফিরিশতারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। কোন মানুষ যখন দ্বীনি ইল্ম শিক্ষা করার জন্যে বের হয় তখন ফিরিশতারা তাদের পায়ের নীচে ডানা বিছিয়ে দেয়। কোন ব্যক্তি যখন কাউকে দ্বীন শিখায় তখন সমস্ত আকাশের ফিরিশতারা তার জন্যে দুআ করে। সকাল বেলা কেউ যদি কোন রোগীর শুশ্রূষা করে তাহলে সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তুর হাজার ফিরিশতা তার জন্য দু'আ করতে থাকে।

আল্লাহ তাআলা ফিরিশতাদেরকে মানুষের সেবায় লাগিয়ে রেখেছেন। মানুষ যখন ইবাদতপূর্ণ কাজ করবে তখন তাদের মধ্যে ফিরিশতাদের গুণাবলী সৃষ্টি হবে।

ফিরিশতাদের গুণ হল—

لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ (پ/٢٨)

"তারা আল্লাহর নির্দেশের অবাধ্য হয় না; তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তারা তাই করে।"

সম্মানিত বন্ধুগণ!

ইবাদতের মাধ্যমে মানুষ ফিরিশতার গুণাবলী অর্জনে সক্ষম হয়। মানুষের মধ্যে যার প্রতি মহব্বত ও আকর্ষণ থাকে তার মধ্যে তাই ছায়া পড়ে; তারই গুণাবলীর প্রতি বিশ্বায়ন ঘটে। তাই কোন ব্যক্তি যদি ছাগলের রাখালী করে তাহলে তার মধ্যে নম্রতা সৃষ্টি হবে আর উট চড়ালে বাড়বে কাঠিন্য। কারণ, উটের স্বভাবের মধ্যে কাঠিন্য আছে আর ছাগলের স্বভাবের মধ্যে আছে নম্রতা, স্বাভাবিক কারণে মানুষের সম্পর্ক যদি ফিরিশতাদের সাথে হয় তাহলে তাদের মধ্যে ফিরিশতাদের গুণাবলীই সৃষ্টি হবে।

তাবলীগে বের হওয়ার পর মসজিদভিত্তিক যেসব আমল বয়ান করা হয়, সেসব আমলের প্রত্যেকটিতেই ফিরিশতা থাকে। একই নিয়মের আওতায় মানুষ যদি কিছু দিন এ পথে কাটায় তাহলে তার স্বভাব ফিরিশতাদের মত হয়ে যায়। অথচ মানুষটি ইতিপূর্বে শরাবী ছিল। মদ্যপায়ী ছিল। তাকে শরাব পান করতে নিষেধ করা হয়নি। কেউ জানেও না সে মদ্যপায়ী। কিন্তু ফিরিশতাদের সংস্পর্শে আসার ফলে তার মদের নেশা কেটে গেছে। ফিরিশতা হয়ে গেছে সে। সে এখন স্বীয় মা'বুদের নাফরমানীর কথা ভাবতেও ভয় পায়।

কিছু আমলতো এমন আছে যা ফিরিশতার উপস্থিতিতে থাকে আলোকিত উদ্ভাসিত। আবার কিছু আমল এমনও আছে যাতে শয়তানের ভয়ংকর উপস্থিতিও থাকে অনিবার্য। এসব কাজ ও আমল থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। প্রকৃতপক্ষে শয়তানের পরিবেশে থাকলেই মানুষের মধ্যে শয়তানী স্বভাবের সৃষ্টি হয়। শয়তানের মধ্যে তিনটি মন্দ গুণ আছে–

أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ (پ/١)

১. আল্লাহর আদেশ অস্বীকার করেছে।

২. অহংকার করেছে ও

৩. অকৃতজ্ঞ হয়েছে।

শয়তানের সংস্পর্শে থাকলে এই তিনটি গুণ সৃষ্টি হয়। সাথে সাথে যে সব আমলে ফিরিশতা হাজির হয়, সেগুলোও বলা হয়েছে। তাবলীগে যেসব আমলের কথা বলা হয় তার সবগুলোতেই ফিরিশতা হাজির থাকে। এ সম্পর্কে প্রচুর হাদীসও রয়েছে।

শয়তান মানুষের উপর কখন হামলা করে একথা কুরআন-হাদীসে বারবার বলা হয়েছে। কেউ যদি 'বিসমিল্লাহ' ছাড়া খেতে বসে শয়তান তার সঙ্গে বসে। রাতের বেলা ঘর বন্ধ করার সময় 'বিসমিল্লাহ' না বললে শয়তান সঙ্গে থাকে।

ঘরের ভেতর অবস্থান নেয়। বাথরুম ও পায়খানায় যাবার সময় 'বিসমিল্লাহ' না পড়লে শয়তান গুপ্তাঙ্গ নিয়ে খেলা করে। স্ত্রী সহবাসের পূর্বে কাপড় সরাবার পূর্বে বিসমিল্লাহ না পড়ে থাকলে চূড়ান্ত মুহূর্তে নির্ধারিত দু'আ পাঠ না করলে সঙ্গে শয়তানও সহবাস করবে। প্রসবিত সন্তানের মধ্যেও শয়তানের প্রভাব থাকে। এই বাচ্চার ভাল হওয়া কঠিন।

এভাবে যেখানেই মানুষ আল্লাহর বিধান লংঘন করবে সেখানেই শয়তান সঙ্গী হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে–

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ ـ (پ/١٥)

"যে ব্যক্তি আল্লাহর উপদেশ ভুলে যায়, অমনোযোগী হয়ে পড়ে আমি তার জন্যে একজন শয়তানকে বন্ধু বানিয়ে দেই।"

হযরত আবু বকর (রা.)

এক লোক হযরত আবু বকর (রা.) কে খুব গাল-মন্দ করল। হযরত আবু বকর (রা.)ও বরদাশত করতে লাগলেন। নীরবে সয়ে যেতে লাগলেন। পাশেই উপবিষ্ট রাসূল (সা.)। কিছুক্ষণ পর হযরত আবু বকর (রা.)ও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনিও বলতে শুরু করলেন। তখন রাসূল (সা.) ওখান থেকে ওঠে গেলেন। পরে হযরত আবু বকর ওঠে রাসূল (সা.)-এর খেদমতে হাজির হলেন। হযরত আবু বকর (রা.) আরয করলেন, হযরত! যতক্ষন ওরা আমাকে বকাঝকা করছিল ততক্ষণতো আপনি নীরবে বসে রইলেন। আর আমি মুখ খুলতেই ওঠে চলে আসলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেনঃ

যতক্ষণ তারা তোমাকে গাল-মন্দ করছিল ততক্ষণ একজন ফিরিশতা তোমার পাশে দাঁড়িয়ে তোমার পক্ষ থেকে প্রতিহত করছিল। কারণ, যতক্ষণ তুমি বরদাশ্‌ত করছিলে ততক্ষণ আল্লাহর গায়বী সাহায্য তোমার পক্ষে ছিল। আর তুমি বলতে শুরু করতেই একটা ঝগড়া খাড়া হয়ে গেল। ফলে ফিরিশতা চলে গেল। শয়তান এসে হাজির। আমিতো আল্লাহর নবী। শয়তানের মজলিসে তো আর আমি থাকতে পারি না। তাই চলে এসেছি।

মুহ্‌তারাম!

এই ঘটনা একথাই প্রমাণ করে, মানুষ যতক্ষণ বরদাশ্‌ত করতে থাকে ততক্ষণ তার সাথে আল্লাহর গায়বী সাহায্য থাকে। আর ঝগড়া বেঁধে গেলেই শয়তান এসে দাঁড়ায় সদর্পে। সরে পড়ে তখন ফিরিশতা।

সারা পৃথিবী কখন ধর্মাশ্রয়ী হবে?

প্রিয় বন্ধুরা!

মানুষ যখন ধর্মানুরাগী হয়, ইবাদতপূজার হয় তখনই তাদের মধ্যে ফিরিশতার গুণাবলী সৃষ্টি হয়।

ইবাদত চার প্রকার। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত। আল্লাহ তায়ালা মানুষের উপর এই চারটি ইবাদত ফরয করেছেন। এই চারটি ইবাদত যদি ঠিক হয়ে যায় তাহলে এই ইবাদত-ই মানুষকে সৎ ও স্বভাবী বানিয়ে দিবে। পৌঁছে দিবে আল্লাহ পর্যন্ত। আর সারা পৃথিবী যখন এভাবে ধর্মাশ্রয়ী হবে। ইবাদাশ্রয়ী হবে তখন পৃথিবী জুড়ে সৃষ্টি হবে চরিত্রের সুন্দর শীতল বাতাস। সৃষ্টি হবে উন্নত মানব সভ্যতা ও পবিত্র-পরিচ্ছন্ন লেনদেন।

অন্যদের কাছে কি আছে?

ইবাদত এক গুপ্ত সম্পদ। দুনিয়াদারদের কাছে ইবাদতকারীরা যায় না। নামায আমাদের মসজিদের ভেতরে, রোযা আমাদের উদরে, যাকাত দেই আমরা মুসলমানদেরকেই। অমুসলমানরা এর হকদারও নয়। হজ করি বাইতুল্লাহ গিয়ে। সেখানে অমুসলিমদের প্রবেশ নিষেধ। তাই আমাদের ইবাদতগুলো গুপ্তই থেকে যায়। তবে এই ইবাদত থেকে এক অসাধারণ শক্তি সৃষ্টি হয়। সেই শক্তিতে সজীব হয়ে ওঠে আমাদের চরিত্র। প্রাণিত হয় আমাদের সমাজ। বীর্যবান হয় আমাদের লেন-দেন। আর এরই মাধ্যমে অন্যরাও প্রভাবিত হয় আমাদের ইবাদতের পরশে।

চরিত্র বিকাশের পথ

আমাদের ঘর-বাড়ির চরিত্র, আমাদের লেন-দেনের স্বচ্ছতা,আমাদের জীবন যাপনের পবিত্রতা অন্যরা দেখে। স্কুলে শিক্ষকদের চরিত্রে রেঙে ওঠে শিক্ষার্থীরা। ব্যবসা-বাণিজ্যে আমাদের চরিত্রের পরিবেশ গড়ে ওঠে। এর মাধ্যমে বিকশিত হয় দ্বীন ঈমান। প্রচারিত হয় আমাদের ইসলাম। চরিত্র বিকাশের পথ আমাদের জীবন সংসারের প্রতিটি অঙ্গন। সৃষ্টির উৎস মসজিদ ও ইবাদত।

ইবাদতের সৃষ্টি

নামায, রোযা, হজ, যাকাত – এ চারটি যদি জীবন্ত থাকে তাহলে এগুলো থেকেই সৃষ্টি হয় চরিত্র। নামাযের দ্বারা নামাযের চরিত্র সৃষ্টি হয়। রোযার দ্বারা সৃষ্টি হয় রোযার চরিত্র। হজ শিখায় হজের চরিত্র। যাকাত দেয় যাকাতের রং।

নামাযের স্বভাব

নামাযের স্বভাব কি?

নামাযের স্বভাব হল, পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য। নামাযের মধ্যে মুসল্লীর হাত-পা চোখ সবকিছুই থাকে আল্লাহর নির্দেশের অধীন। এটাই নামাযের স্বভাব। নামায জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এই চরিত্রের প্রতিফলন ঘটাতে চায়। মানুষের প্রতিটি অঙ্গ জীবনের সকল অঙ্গনে আল্লাহর হুকুমের অধীন হবে। নামায প্রতিনিয়ত এরই দাওয়াত দিয়ে যায়।

নামায শিক্ষা দেয় আল্লাহর বিধানের সামনে, আল্লাহর দ্বীনের স্বার্থে জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দেবার কথা। যখন যেভাবে আদেশ হয়েছে তা যদি পূর্ণাঙ্গভাবেই পালিত হয় নামাযে তাহলে নামাযের বাইরে জীবন দানের আহ্বান আসলে তা উপেক্ষিত হবে কেন?

নামাযের মধ্যে চোখের উপর কড়া নির্দেশ থাকে– কোন দিকে তাকাতে পারবেনা। নামাযের বাইরেও এই আদেশ প্রতিপালিত হতে হবে। যেমন, আপনি দোকানে বসে আছেন। আপনার সামনে দিয়েই হেঁটে যাচ্ছে এক সুন্দরী, রূপসী ললনা। নামাযের দাবী হল, নামাযের মধ্যে যেভাবে তোমার দৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত থাকে, এখানেও থাকবে অনুরূপ নিয়ন্ত্রিত। কারণ, এই লোলুপ দৃষ্টি থেকেই ব্যভিচারের যাত্রা। তাই এই দৃষ্টির উপরই নিষেধাজ্ঞা রয়েছে কুরআনের পক্ষ থেকে।

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ

‘মুমিনদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে, আর লজ্জাস্থানকে যেন রাখে পবিত্র–সংরক্ষিত।’

দৃষ্টি শয়তানের একটি তীর। বিষাক্ত তীর। তাই মসজিদের ভেতরে যেভাবে দৃষ্টির উপর নিষেধাজ্ঞা থাকে বাইরে গেলেও অনুরূপ নিষেধাজ্ঞা বজায় রাখতে হবে।

যাকাতের স্বভাব

যাকাত আল্লাহর নামে সম্পদ বিলাবার আদর্শ শিখায়। যাকাত একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ। চল্লিশ লাখে এক। যদি কেউ এই এক লাখ ঠিক মত বন্টন করে তাহলে তার মধ্যে যাকাতের স্বভাব সৃষ্টি হবে। আল্লাহর নামে বিলাবার গুণ সৃষ্টি হবে। আল্লাহর আদেশ পালনের পথে সম্পদ ব্যয় করার স্বভাব সৃষ্টি হবে। এটাই যাকাতের পয়গাম।

রোযার স্বভাব

রোযা মানুষকে আল্লাহর আদেশের ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণ ও সংযম করাকে শিখায়। খানা-পিনা ও স্ত্রী সহবাস এই তিনটি চাহিদা নিয়ন্ত্রণপূর্বক মানুষ রোযা রাখে। মানুষ বছরে এক মাস বাধ্যতামূলকভাবে রোযা রাখে। আর বাকী এগার মাস? হাঁ, রোযা এমনভাবে রাখতে হবে, যেন আল্লাহর আদেশের সামনে সংক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণের চরিত্র সৃষ্টি হয়ে যায়। তাহলে অবশিষ্ট এগার মাসও চলবে রোযা যাপন।

মানুষ যখন নিজের চাহিদাকে সংযমিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে শিখবে, তার চাওয়া-পাওয়াকে পরাজিত করতে শিখবে, তখন তার হাতে প্রচুর অর্থ বেঁচে যাবে। সৃষ্টি হবে সরল জীবন। তখন তার এই সঞ্চিত অর্থ বিলাবে তাদের মধ্যে যাকাতের সীমিত অর্থ যাদের কাছে পর্যন্ত পৌঁছায়নি।

যাকাত দিতে গিয়ে দেখেছে, নবী বংশের কিছু ঘরানা যারা দরিদ্র, কিন্তু তারাতো যাকাত খেতে পারে না। এই অর্থ তাঁদের প্রয়োজনে ব্যয় হবে।

রমযানে যাকাত আদায় করে ফেলেছে। ঈদের পর এক রাতে প্রতিবেশীর কান্নায় ঘুম ভেঙ্গেছে। জেগে দেখল, তার একটি সন্তান হয়েছে এইমাত্র। এখন তার সেবা প্রয়োজন। অর্থ প্রয়োজন। কিন্তু তার স্বামী বাইরে। সারল্য জীবনের সঞ্চিত অর্থ ব্যয় হবে এখানে। যাকাত ও রমযান মানুষকে এই চরিত্র শিখায়। প্রতিনিয়ত শিখায়।

আহকাম দুই প্রকার

ইবাদততো হল আল্লাহর নির্দেশ। এটা পালন করা মামুলী নির্দেশ। এর বাইরে যা আছে সেগুলো হল আল্লাহ তাআলার চারিত্রিক নির্দেশ। সুতরাং আল্লাহর আহকাম বা নির্দেশও দুই প্রকার। ১. মামুলী-আইনগত। ২. আখলাকী-চারিত্রিক। মামুলী হুকুম অমান্য করলে জাহান্নাম অবধারিত। আর আখলাকী হুকুম অমান্য করলে জান্নাতে কাংখিত মর্যাদা থেকে হবে বঞ্চিত।

আদ্‌ল ও ইহ্‌সান

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে আদ্‌ল ও ইহ্‌সানের আদেশ করে বলেছেনঃ

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ـ (پ/١٤)

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আদল ও ইহ্‌সানের নির্দেশ দিচ্ছেন।'

কিন্তু আদ্‌ল অর্থ কি? ইহ্‌সান অর্থ কি? শাব্দিক 'আদ্‌ল' অর্থ ন্যায়, ইহ্‌সান অর্থ যথাযথ, অনুগ্রহ! মূলতঃ আদ্‌ল বলতে কানুনী আদেশ আর ইহ্‌সান বলতে আখলাকী নির্দেশাবলীকে বুঝানো হয়েছে।

যাকাত না দেয়ার পরিণতি

যাকাত না দেয়া এক মহা অপরাধ। যাকাত অনাদায়ে যাকাতের সম্পদ যখন আসল সম্পদের সাথে মিলিত হয় তখন আসল সম্পদকেও বরবাদ করে দেয়।

একবার এক এলাকায় প্রশাসনের শ্যান দৃষ্টি পড়ল। ব্যবসায়ীদের মধ্যে চরম অস্থিরতা সৃষ্টি হল। এক দীনদার ব্যবসায়ী আমাকে চিঠি লিখে অবস্থা জানাল। আমি জবাবী চিঠিতে জানতে চাইলাম, যাকাত আদায়ে কোন সমস্যা হয়নি তো? হিসেব করে দেখুন! সে কয়েক বছরে যাকাত আদায়ের লিস্ট পাঠাল। আমি যেহেতু ইংরেজ আমলে অংক পড়েছি তাই অংক সম্পর্কে আমার ধারণা ভাল আছে –আলহামদুলিল্লাহ! আর আজকালতো ছেলেরা ক্যালকুলেটর টিপতে পারলেই অংক শিখা হয়ে যায়।

আমি তার হিসাব পড়লাম। হিসাব পড়ে জানিয়ে দিলাম, আপনি এক বছর পাঁচ হাজার টাকা যাকাত কম দিয়েছেন। যে কারণে পরবর্তী তিন বছরও এই 'কম' অব্যাবহত রয়েছে। এর কারণ হল, আপনি যাকাত দিয়েছেন ইংরেজী সাল হিসাবে। আর আমি ধরেছি হিজরী সাল। হিজরী সাল সাধারণতঃ ৩৫৪ কি ৩৫৫ দিনে হয় আর ইংরেজী সাল হয় ৩৬৫ কি ৩৬৬ দিনে। পরে তিনি আমাকে চিঠি লিখে জানালেন, আসলে আমাদের হিসাবই ভুল ছিল– যে কারণে পূর্ণ যাকাত আদায় হয়নি। আর অবশিষ্ট যাকাতের টাকা রুলিং হয়েছে ব্যবসায়। আর সেই টাকাই এই বিপদ টেনে এনেছে।

প্রমাণিত হল, যাকাত যথারীতি আদায় করা না হলে যাকাতের অর্থ অনেক অনর্থ ডেকে আনে; ডেকে আনে সমূহ বিপদ।

যাকাত দিতে হবে সম্মানের সাথে

মুহ্‌তারাম বন্ধুরা!

আপনারা যেখানকার বাসিন্দা আপনাদের যাকাতের অর্থ সেখানকার সমস্যাপীড়িত লোকদের কাজে লাগা উচিত। আর আপনারা আপনাদের এলাকায় দরিদ্র লোকদেরকে চিনেনও। সুতরাং আপনারা যারা সম্পদশালী তাদেরই দায়িত্ব হলো, গরীব লোক খোঁজ করে তাদেরকে যাকাত দেয়া। যাকাতও দিতে হবে তার ঘরে গিয়ে। কারণ ইসলামের দর্শন হল–

نِعْمَ الْأَمِيْرُ عَلٰى بَابِ الْفَقِيْرِ وَبِئْسَ الْفَقِيْرُ عَلٰى بَابِ الْأَمِيْرِ

'গরীবের দোরে আমীরই শ্রেষ্ঠ আমীর, আর ধনীর দোরের ফকীর হলো নিকৃষ্টতম ফকীর।'

তাই ধনীদের উচিত গরীবের ঘরে গিয়ে যাকাত পৌঁছে দেয়া এবং দিতে হবে সম্মানের সাথে। যে মাটি-পাথর দিয়ে মসজিদ তৈরী হয় সে মাটি-পাথরকে আমরা সম্মান করি। তাযীম করি। কারণ, এর মধ্যে আমরা আমাদের ফরয আদায় করি। অনুরূপভাবে অসহায় দরিদ্র মানুষরাও মহা সম্মানের পাত্র। কারণ, তাদের মাধ্যমেও আমরা আমাদের ফরয আদায় করে থাকি।

ইসলাম ঃ ধনী-গরীব সকলেরই

এই পৃথিবীর ধনী মানুষরা চায় গরীবদের কোমর ভেঙ্গে দিতে। তারা চায় কেবল তাদের রাজত্ব ধরে রাখতে। আর গরীবরাও জানে, ধনীদের ভুড়ি ফেঁড়ে তবেই বের করতে হবে তাদের পাওনা সামান্য ডাল-ভাত। অর্থাৎ, ধনীদের কামনা তাদের মোড়লীপনার চির প্রতিষ্ঠা আর গরীবরা ভাবে, তাড়ে ভুড়ি ছেদনের কথা। অথচ আল্লাহ তাআলা সকলেরই প্রতিপালক। তিনি কখনো পক্ষপাতিত্ব করেন না। তাই তিনি রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমে এমন এক জীবন পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন যার মধ্যে ধনী-গরীব উভয় শ্রেণীর অধিকার সংরক্ষিত হয়েছে সমভাবে।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ধনী-গরীবের এই দ্বন্দ্বের মূল উৎস হলো– ধনী গরীবের কোমর ভেঙ্গে কাবু করে রাখতে চায় নিজের রাজত্ব ধরে রাখার জন্যে আর গরীব চায় ধনীর ভুড়ি ফেড়ে অধিকার আদায় করতে। কৌশল হিসাবে ধনীরা সুদের পথ ধরে এগিয়ে আসে আর গরীবরা চুরি-ডাকাতি করে ধনীর ভুড়ি ফাড়তে সচেষ্ট হয়।

দর বৃদ্ধির কারণ সুদ

বাজারের দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির মূল কারণ হল, এই সুদ। এই সুদ বন্ধ হয়ে গেলেই নবীজীর শিখানো সেই সমাজ জীবন আমাদের মধ্যে প্রতিফলিত হবে। সুদের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হবে কর্জ দেয়ার রেওয়াজ। কর্জ দান-সদকা করার সমান প্রতিদান যোগ্য আমল। আর কর্জ আদায়ে অপারগ হলে তাকে সুযোগ দেয়ার মধ্যে রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব। আল্লাহ তাআলা এ মর্মে উৎসাহিত করে ইরশাদ করেছেনঃ

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ (پ/٢)

অর্থাৎ, "দরিদ্রকে প্রসন্ন পর্যন্ত সুযোগ দাও।"

অন্যত্র বলেছেনঃ

وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌلَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (پ/٣)

অর্থাৎ সুযোগ দেয়ার পরও যদি না দিতে পারে তাহলে ক্ষমা করে দাও।

তোমাদের জন্যে ভাল হবে। এটাই রাসূল (সা.)-এর সমাজ বিজ্ঞান। তিনি এই জীবনাদর্শই আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।

সমবেদনার জন্যই মানুষের সৃষ্টি

এটা একটা ভিন্ন সমাজ ব্যবস্থা। এই সমাজে আপনি আপনার সম্পদ ব্যবহার করতে পারেন। আপনি মসজিদে বসে যখন ইবাদত করেছেন তখন আপনার মধ্যে ঈমানী শক্তি সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহর খাযানার প্রতি বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে। কারণ, আপনি শুনেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "মানুষের প্রতি অনুগ্রহ কর। তোমার প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করবেন। আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেনঃ

وَمَا اَنْفَقُوْا مِنْ شَيْئٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ

অর্থাৎ, 'যতটা খরচ করবে আল্লাহ তাআলা তার প্রতিদান দিবেন।'

হ্যাঁ, এই দয়া করার জন্যেই মানুষের সৃষ্টি। সে পরকালীন প্রতিদান প্রত্যাশায় খরচ করে।

বাজারে নয় বছরের একটি মেয়ে এসেছে। সে এসে বলেছে, ভাই দোকানী! এই দু'টাকা নাও। আমাকে চাল, ডাল, চিনি, আটা দাও। দোকানী ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে। অন্য দোকানে গেছে। সেখানেও অর্ধচন্দ্র খেয়েছে। এক দোকানে বসে আছে আল্লাহর এক খলীফা। তার কাছে এসে যখন বালিকা দুই টাকা দিয়ে এক গাদা সওদা চেয়েছে, সেতো নামাযের মাধ্যমে নামাযী গুণ তৈরী করেছে। সে লিখেছে–

درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو
ورنہ طاعت کیلئے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں

আন্তরিকতা আর সমবেদনার জন্যেই মানুষের সৃষ্টি;
অন্যথায় ইবাদতের জন্যে তো ফিরিশতাই যথেষ্ট ছিল।

এই হল আখলাক

হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা মানুষকে সমবেদনার জন্যেই সৃষ্টি করেছেন। অন্যথায় ইবাদত সে ফিরিশতারাও করতে পারে। কিন্তু মানুষের ইবাদত একটু ভিন্ন ধরনের। তার মধ্যে ইবাদতের দ্বারা আখলাক সৃষ্টি হয়। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। সৃষ্টির প্রতি হয় সমবেদনার সৃষ্টি। মানুষের সাথে ফিরিশতাদের মৌলিক পার্থক্য এটাই।

যাই হোক, এখন সেই নয় বছরের মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে সেই আল্লাহর বান্দার দোকানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে এবং ঢেকুর তুলে কাঁদছে আর বলছে, কয়েক মাস হল এক্সিডেন্ট করে আমার বাবা মারা গেছেন। এখন আমার শুধু মা আছেন। আমাদের কোন জায়গাজমি নেই। কোন ব্যবসাবাণিজ্যও নেই। আমার মাও খান্দানী বংশের মেয়ে। সম্ভ্রান্ত বংশের নারী। তিনি এখন বিধবা। আমাদের জীবন যাপনের কোন উপায় নেই। মা এখন অন্যের ঘরে ঝি এর কাজ করেন। আমাদের এই দারিদ্রের সুযোগে আমার মাকে দিয়ে লোক কাজ করায় বেশী। পয়সা দেয় কম। আর সেই সামান্য অর্থ দিয়ে আমাদের কোন রকম গুজরান হচ্ছে। আজ মা কোন কাজ পাননি। তাই আমাদের ঘরে আজ কিছুই হয়নি। এই দুই টাকায় যদি কেউ সওদা দেন তাহলেই আমাদের ঘর আজ আগুন জ্বলতে পারবে। অন্যথায় আজ আমাদের আগুন জ্বলার কোনই ব্যবস্থা নেই। আপনি আমাদের প্রতি একটু অনুগ্রহ করুন। আল্লাহ আমাদের মঙ্গল করুন।

আল্লাহর বান্দা এই কথাগুলো শোনার পর কেঁদে ফেলেছে। তাঁর মন থেকে অবচেতনভাবেই বেরিয়ে এসেছে, 'হে আল্লাহ! আমাদের মহল্লায় একটি পরিবার এত অসহায়, অথচ আমরা জানি না! আমরাতো খুবই মন্দ মানুষ! আমরা কত ভাল খাবার খাই। আর এদের জন্য রুটিরও ব্যবস্থা নেই। তারপর চার-পাঁচশ' টাকার সওদা একটি টুকরীতে করে নিজের কর্মচারী দিয়ে বিধবার ঘরে পৌঁছে দিয়েছে। সাথে সেই দুটি টাকাও ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে।

এখন সেই ঘরে যখন মজার মজার খাবার পাক হবে, কয়েকদিন ধরে শুকনো রুটি খেয়ে ক্লান্ত শিশুরা যখন সুস্বাদু খাবার ঘ্রাণ পাবে তখন এতিম শিশু আর বিধবার নয়ন চিড়ে বেরিয়ে আসবে আনন্দাশ্রু আর তারা যখন এই ব্যবসায়ীর জন্যে দুটো হাত তুলে করুণাময়ের দরবারে প্রার্থনা করবে তখন আসমানের মালিক এই বিধবা এতীম শিশুদের চোখের পানির বরকতে এই ব্যবসায়ীর আগামী সাত প্রজন্মের ক্ষুধার অভাব হয়তো দূর করে দিবেন। এটা কী-ইবা আশ্চর্যের বিষয়।

এবার রাতের বেলা ব্যবসায়ী যখন ঘরে ফিরেছে তখন পরিবারের সবাইকে ডেকে এই হৃদয়বিদারক কাহিনী শুনিয়েছে। এখন স্ত্রী বলছে, অনুমতি দিলে আমিও গিয়ে কিছু পয়সা দিয়ে আসতে পারি। তারপর স্ত্রী গিয়েছে। স্বচক্ষে অবস্থা দেখে এসে স্বামীকে বলছে, দেখ, এই মহিলার ছয় মাস হয় স্বামী মারা গেছে। অথচ এই মহিলার বিয়ের উপযুক্ত চারটি মেয়ে রয়েছে। অর্থের অভাবে বিয়ে দিতে পারছেনা। তাছাড়া ঘরে আরও ছোট ছোট মেয়ে আছে। তারা আজ অভাবের তাড়নায় কেবল তরপাচ্ছে। মেয়েরা অসুস্থতায় কাতরাচ্ছে, চিকিৎসারও কোন ব্যবস্থা নেই।

এই বিবরণ শুনে স্বামীর চোখ বেয়ে অশ্রু নামছে। স্ত্রীও কাঁদতে শুরু করেছে। মা-বাবার কান্না দেখে সন্তানরাও গলে গেছে। তাদের গণ্ড বেয়েও নামছে অশ্রুর বন্যা। এখন তারা সবাই মিলে আল্লাহর দরবারে কাঁদছে। ‘হে আল্লাহ! কিয়ামতে আমাদেরকে ক্ষমা করে দিও! আমাদের মহা অপরাধ। আমরা কি সুস্বাদু খাবার খাচ্ছি। আর আমাদের প্রতিবেশী ক্ষুধায় কাঁদছে। হে আল্লাহ! কিয়ামতের দিন আমাদেরকে পাকড়াও করো না। আমাদের ভুল হয়ে গেছে। অতঃপর সে তার স্ত্রীকে চার পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে বিধবার ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছে মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করার জন্যে।

মুহ্তারাম বন্ধুরা!

একটি ঘটনার কথা শুনেই আমাদের মন গলে গেছে, কান্না এসে পড়েছে। আমি বলি, এই একটি পরিবার নয়, আমাদেরকে ভাবতে হবে পৌনে চারশ’ কোটি মানুষ নিয়ে। আজ পৌনে চারশ’ কোটি মানুষ ঈমান ছাড়া পৃথিবী থেকে যাচ্ছে। যাদের মৃত্যুর সাথে সাথে শুরু হয়ে যাবে ফিরিশতাদের প্রহার। অসম্ভব শাস্তি। তাদেরকে আগুনে দগ্ধ করা হবে। বলুন, এই জন্যে কে কাঁদবে?

মাখ্লুকের ভালোবাসায় নবীজী ছিলেন ব্যথিত

এসব কারণে নবীজী (সা.) অস্থির থাকতেন। তাঁর সম্পর্কে সীরাত গ্রন্থে আছে–

دَائِمَ الْفِكْرِ مُتَوَاصِلَ الْاَحْزَانِ

‘তিনি সর্বদাই চিন্তা করতেন, এই অবস্থা তাঁকে রীতিমতই কষ্ট দিত।’

তিনি দেখতেন, মানুষের মধ্যে ঈমান নেই। তখন তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন। আর বলতে থাকতেন, হে আল্লাহ! তোমার মাখলুক তোমার বিধান লংঘন করছে। তারা মারা যেতেই তাদের উপর শাস্তি শুরু হয়ে যাবে। হে

আল্লাহ! আমি কিভাবে তাদেরকে বুঝাব? রাতের বেলা ওঠে তিনি কাঁদতেন। অস্থির হয়ে কাঁদতেন। আর বলতেনঃ 'হে আল্লাহ! হেদায়াতের পথ খুলে দাও।'

রাতের বেলা তিনি কাঁদতেন। আর দিনের বেলা মানুষের ঘরে ঘরে যেতেন। গিয়ে গিয়ে বলতেন ঃ আমি আল্লাহর নবী। তারা মারত। তিনি বলতেন ঃ দেখ! তুমি আমাকে ধাক্কা দিয়েছ। পাথর মেরেছো। দাঁত ভেঙ্গেছ। তোমার যা করার ছিল তা তুমি করেছ। আমাকে মারতে মারতে বেহুঁশ করে ফেলেছ। কিন্তু আমিতো তোমাদের কাছে কেবলমাত্র এই আশায় এসেছি তোমাদের কল্যাণ কামনায়। দেখ, আমি সাধারণ মানুষ নই। আমি আল্লাহর নবী। আমার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী আসে।

শোন! মরণের পরেও একটি জীবন আছে। কিয়ামত আছে। আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে। আল্লাহর ওয়াস্তে কথা শোন। কথা মান। কিন্তু তারা বিনিময়ে পাথর মারছে। নবীজী (সা.) বেহুঁশ হয়ে পড়ে যাচ্ছেন। বেহুঁশ অবস্থায় সাহাবী হযরত যায়েদ ইবনে হারিছা (রা) নবীজীকে কাঁধে তুলে নিয়ে যাচ্ছেন। জিজ্ঞেস করার মতও কেউ নেই।

মক্কা থেকে হেটে তিনি তায়েফ আসছেন। মক্কায় তাঁর কথা শোনার কেউ নেই। বড় আসা নিয়ে যাচ্ছেন তায়েফে। যদি সেখানকার লোকেরা শোনে! তারা যেন পবিত্র জীবনের সন্ধান পায়।

মিনায় দ্বীনের দাওয়াত

নবীজী (সা.) মিনায় যেতেন। প্রতিটি গোত্রের কাছে গিয়ে বলতেন ঃ

مَنْ يَنْصُرُنِى

'কে আমাকে সাহায্য করবে?'

হ্যাঁ, কে আছে আমাকে সাহায্য করার মত। আমি একটা পবিত্র জীবনের সন্ধান নিয়ে এসেছি। কে আছে তা গ্রহণ করার মত? কে আছ এমন যে আমাকে নিয়ে যাবে আর আমি আমার রবের কথা শোনাব? এমন সময় এক জালেম এসে উটের উপর প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে। নেচে ওঠে উট। নবীজী ছিটকে পড়েন মাটিতে। ধূলোয় ধূসরিত হল সারা বদন। তিনি বুঝতে পারেন, এরা আমার কথা মানবে না। ছুটে যান অন্য কবীলার কাছে। থেমে দাঁড়ান না মুহুর্তের জন্যে! তখন এগিয়ে আসে এক সম্প্রদায়! তারা আরয করে, আরবরা তোমাকে মানছে। চল আমাদের সাথে, তোমাকে আমরা মানব। আমরা তোমার হয়ে লড়াই করব।

বেদনার সাল

এই সময় নবীজীর (সা.) চাচা আবু তালিব মারা যান। তিনি নবীজীর বড় হৃদয়বান অভিভাবক ছিলেন। মারা যান হযরত খাদিজা (রা.)। যিনি নবীজীর সুখ-দুঃখের বন্ধু ছিলেন। বিপদে পাশে দাঁড়াতেন।

নবীজী (সা.) চিন্তা করলেন, চাচাজান নেই। খাদিজাও চলে গেল! আর মক্কার লোকেরা আমাকে মারতে চাচ্ছে। চারিদিক থেকে আক্রমণ করতে চাচ্ছে। এই বছরটি সত্যিই আমার জন্যে ভয়ানক বেদনার সাল। কি করবেন! ভাবলেন, তায়েফ গিয়ে দেখি। গেলেন, রক্তাক্ত হয়ে ফিরে এলেন। কিন্তু মার খেয়েও কি বদ-দু'আ করেছেন, না। দু'আ করেছেন। বলেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَشْكُوْ اِلَيْكَ ضُعْفَ قُوَّتِىْ وَقِلَّةَ حِيْلَتِىْ

'হে আল্লাহ! আমার অভিযোগ আমার প্রতি। আমিই দুর্বল। আমি ভাল কৌশলও জানি না।"

মুহ্তারাম বন্ধুগণ!

দ্বীনের জন্যে, উম্মতের জন্যে নবীজী (সা.) কত কষ্ট করেছেন! তবু যেন উম্মত জাহান্নামের কষ্ট থেকে বেঁচে যায়।

নবীজী যেভাবে এতীম হয়ে পৃথিবীতে এসেছিলে, আজ পৃথিবীর চারিদিকে নবীজীর দ্বীনকেও তেমনি এতীম মনে হচ্ছে। এই দ্বীন সত্যিই আজ বড় এতীম। নবীজীর মতই এতীম!

সেদিন মক্কায় অনেক মহিলাই বাচ্চার জন্যে এসেছিল। কিন্তু নবীজীকে কেউ নিতে চায়নি। কারণ, তাঁর বাবা নেই। নিলে উপহার পাওয়া যাবে না। অর্থ পাওয়া যাবে না। হালিমাও নিতে চাননি। তিনিও খুঁজেছে ধনী ঘরের সন্তান। কিন্তু তাঁর স্তনে দুধ ছিলনা। তাঁর উষ্ট্রী দুর্বল ছিল। তাঁর দুগ্ধপায়ী সন্তানই কাঁদতো দুধের অভাবে। এই দেখে কোন অভিভাবক তাকে সন্তান দিতে রাজী হল না। অবশেষে বললেন, খালি ফিরে যাব? এই এতীত বাচ্চাটাকেই নিয়ে যাই।

হালিমা ভেবেছিলেন, দুনিয়ার কিছু না পেলেও আখেরাতে সওয়াব পাব। কিন্তু যখন নবীজী (সা) হযরত হালিমা সা'দিয়ার কোলে ওঠে বসলেন তখনই তাঁর উভয় স্তন দুধে ভরে এলো। এক স্তন নবীজী পান করলেন অন্য স্তন পান করলেন নবীজীর দুধ ভাই। শুরু হল বরকত।

মুহতারাম বন্ধুরা! তারপর যখন উটের উপর চড়ে রওনা হলেন তখন উটের শরীরেও শক্তি এসে গেল। দ্রুত চলতে শুরু করল। হ্যাঁ, আজ আমরাও যদি

নবীজীর এই এতীম দ্বীনকে কোলে তুলে নিতে পারি আমাদের জীবনেও বরকত আসবে। পবিত্রতা আসবে। মা হালিমা নবীজীকে তুলে নিয়ে 'সা'দিয়া' সৌভাগ্যবান হয়েছিলেন। আমরা যদি তাঁর এতীম দ্বীনকে তুলে নিতে পারি আমরাও সৌভাগ্যবান হতে পারব। আমরা সারা পৃথিবী ঘুরব। ঘুরে ঘুরে এই বরকতের কথা বলব।

মুহতারাম বন্ধুগণ!

এই কাজের জন্যে পৃথিবীময় পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। নারীদের মধ্যে পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। সর্বত্র দ্বীনের কথা বলতে হবে। ছোট বাচ্চাদেরকে বলতে হবে। সারা পৃথিবীর দরদ নিয়ে বলতে হবে। কুরবানীওয়ালা আবেগ নিয়ে বলতে হবে। বলতে বলতেই একীন সৃষ্টি। শক্তি সৃষ্টি হবে।

এটা শুধু চার মাসের কাজ নয়। শুধু এক বছরের কাজ নয়, বরং সারা জীবনের কাজ। আল্লাহ তাআলা বলেছেনঃ

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ

'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জান-মাল ক্রয় করে নিয়েছেন।' এটা সারা জীবনের কাজ। এ কাজ করতে করতে মরতে হবে। বিছানা-বাটি নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পড়। হয়তো আল্লাহর দ্বীন যিন্দা হবে নতুবা তোমাদের কবর হবে ইউরোপে।

সমাপ্ত